ডোম

বৈদ্যনাথ সাহা

ইউনিভারসাল বুক ডিপো
৫৭/ডি, কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ, ১৩৫৪

প্রকাশক :
এ. মল্লিক
ইউনিভারসাল বুক ডিপো
৫৭/ডি, কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

মুদ্রাকর :
শ্রীতারক নাথ হাজরা
দি করুণাময়ী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৩৬/১, রাধামাধব সাহা লেন
কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদ :
অশোক দাস

পরম পূজনীয়া

মা-কে

—ভাল লাগছে না, বড্ড ভাবনায় পড়োছ।

—ভাবনা, কেয়া চিজ্ হ্যায় বাপু? হামার সমঝমে তো কুছু আসছে না।

পদম চট্ করে নিজেকে সামলে নেয়, কথাব মোড় ঘুরিয়ে বলে, সোচ্নেকা বহুত কুছ্ হ্যায় বেটি। তারপর টগবের দিকে তাকিয়ে হেসে বলে, তুর উমর বাড়ছে, শাদী দিতে হবে। তো ক্যায়সে শাদী দিব, লেড়কা কাঁহা মিলবে, পয়সা ভি কুথা মিলবে, হাজার ভাবনারে বেটি—

—সমঝ গিয়া, টগর মুখ গোমড়া করে বাপের পাশে বসে পড়ে, তারপর বলে, তুমহি হামাকে খেদিয়ে দিতে চাহাছো বাপু।

পদম হো হো করে হেসে ওঠে, বলে, শাদী দিলে কি খেদানো

হয়রে বেটি? বাবুলোক তো কত ধুমধাম ক'রে লেড়কীর শাদী দেয়, আমোদ-আহ্লাদ করে। হামি গরিব আদমি, লেকিন হামার তো কুছু সাধ-আহ্লাদ আছে। বড়লোকের বেটিদের মতুন তুর সুরত, তো হামার শখ হবে না ক্যানে? তুর শাদী হলে হামার তো খুশ-মেজাজ হবে!

—মন ভুলানাকী বাত ছোড়্ দো বাপু। এহি দুনিয়ামে গরিব আদমির কুছু শখ নাই, রং তামাসা তো খালি পয়সাঅলা আদমিকো লিয়ে, আসলি বাত ইয়ে হ্যায় কি তুম মুঝে—

—চুপ্ যা টগর! পদম চঞ্চল হয়ে ওঠে, বলে, তু হামার কত সাধের বেটি, ইসব বাত বললে মনে বড় দুখ লাগে। তুকে লিয়ে হামার সাধের ওড় নাই।

টগর বাপের কাছে সরে এসে বসে। বাপের মনে দুখ দিলে ওর মনটা খুব আনচান করে ওঠে। পদম টগরের মাথায় আদরের হাত বুলিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পর টগর বাপের পাশ থেকে উঠে দাঁড়ায়। শ্মশান চত্বরের পেছনে জঙ্গলের দিকে দৌড়য়, বলে, তাহলে হামাকে তুমহি কুনোদিন খেদিয়ে দিয়োনা বাপু।

টগর এ বছর পনেরো পেরিয়ে ষোলয় পা দিয়েছে। সোমত্ত মেয়ে। জলদি বিয়ে দিতে না-পারলে বিপদ। আনাচে-কানাচে কানাঘুষো শুরু হয়েছে, বাতাসে ভেসে আসছে তার বোল। এরপর ঢাকঢোল বাজবে। ইতিমধ্যে দু'একজন পদমকে জানান দিয়ে গেছে: লেড়কী জওয়ানী হো রহী হ্যায়! অর্থাৎ লেড়কীর শাদীর জন্যে তল্লাশ লাগাও। পদম যেন বেহুদা আদমী, তাই এত্তেলা দিয়ে গেছে।

বামুন-কায়েত-মহাজনদের অন্দরমহলের কত কিস্সা পথে ঘাটে ছড়িয়ে পড়ছে আজকাল। ঘরের লেড়কী সোমত্ত হলে বড় ঝঞ্ঝাট। আর সে তো গরিব আদমি। ওর কোন ধর্ম নাই, জাত নাই, ভাষা নাই। হিন্দু জাতের শরিক হয়েও ওরা তামাম দুনিয়ার আদমির কাছে অচ্ছুৎ। ফলে ওদের কোন জাত নাই, ধর্ম নাই। ডোম-

ঁড়ালের আবার ধর্ম কী! সারা জনম শুনতে শুনতে কান পচে গেল
দিমের। ইদানীং বাবুরা সোহাগ করে ওদের হরিজন বলে। মানে
পতিত্। মানে হরিবোল গাইতে গাইতে যখন মরদেহকে শ্মশানে
আনা হয় তখন ওদের ছোঁয়া পেলে তবেই নাকি জীবের মুক্তি ঘটে।
া পতিতপাবন। বড় তাজ্জব কি বাত! জীবিত কালে যাদের
ছায়ায় মানুষের জাত-ধর্ম নষ্ট হয়, এমন কি হয়ত প্রায়শ্চিত্ত পর্যন্ত
করতে হয়, মরণকালে তাদের ছোঁয়া পেলে তবেই আত্মার মুক্তি ঘটে।
ড় অদ্ভুত সব ব্যাপার! এই হল ধর্ম, সৎ আচরণ। এসব তত্ত্বকথা
ন হাসি পায় পদমের। পদম বোঝে সব, কিন্তু ভাষায় প্রকাশ
রতে পারে না। কারণ ওদের কোন নিটোল ভাষা নাই।

সেই কোন্ সত্যযুগে, সাত কি সতেরো পুরুষ আগে ওর পূর্বপুরুষ এবং তার জাতভায়েরা দক্ষিণ বিহার থেকে এই বাংলার মাটিতে, যখানে গঙ্গার স্রোত আর পবিত্র বাতাস বইছে, যেখানে বহতা জীবন, খর জনপদ আর শান্ত পরিবেশ, সেখানে এই ছায়াশীতল ভাগীরথীর তীরে এসে বাসা বেঁধেছিল। ফলে দুই দেশের ভাষার মিশেলে আর এই সতীচরের ভাষার আঞ্চলিক টানে ওদের মুখে মুখে এতকাল ধরে এ-এক অদ্ভুত ভাষা তৈরী হয়েছে, যা পুরোপুরি হিন্দী নয়, বাংলাও য়, বাংলা-হিন্দীর অসম মিলন, যার আগাগোড়া খুঁজে পাওয়া দায়। দম রক্তার্জিত সংস্কারে একথাও বুঝেছে যে জাত-ধর্ম-ভাষা-আচার-অনুষ্ঠান সব কিছু মিলেমিশে ওরা এক স্বতন্ত্র গোষ্ঠী, এক আলাদা জীবজগতের মানুষ, বাবু সমাজে যাদের চলাচল আছে, কিন্তু জলচল নাই, মাথা গোঁজার ঝুপড়ি আছে, কিন্তু জাত মানুষের সমাজে কোন ঠাঁই নাই। ওরা মনুষ্য সমাজে সবচেয়ে নিচু ঘৃণ্য অচ্ছুৎ জীব হিসেবেই গণ্য। সেইজন্য সবচেয়ে ঘৃণ্য শুয়োর ওদের কাছে এত প্রিয় পোষা জীব? শুয়োরের মাংস পুড়িয়ে খাবার রীতি সেই কারণেই কি ওদের কাছে ধর্মীয় সংস্কারে পরিণত হয়েছে? এটা কি উঁচু জাতের ওপর প্রতিহিংসা নেবার কৌশল? নাকি দুনিয়া থেকে অপবিত্রতাকে দূর করার মহান ব্রত? অথবা উভয়ই? পদম জানে

না! একালে শুয়োর ওদের কাছে দামী ও দুর্লভ জীব। শুয়োর পোষার ক্ষমতা তাদের নাই। শুয়োরের কারবার এখন হাতবদল হয়ে ভিন্ দেশে মোটা টাকার মালিকের কাছে ঠাঁই পেয়েছে। তার চেয়ে বরং উঁচু জাতের কাছে শুয়োর হিসেবে গণ্য হওয়া অনেক সহজ। মালিক মহাজনের দুয়োরে নিজেদের বলিদানের জন্য তৈরী রাখা অনেক সহজ। হয়ত জাত মানুষের দুয়োরে নিজেদের বলি দেবার জন্যেই ওদের পৃথিবীতে জন্ম হয়েছে।

এতকাল ওর পূর্বপুরুষদের তবু স্বাধীনভাবে চরে খাবার মাঠ ছিল। কিন্তু এ যুগে তা আর নাই। এখন নিজেদের প্রাণ বলি দিতে হবে। এতকাল পদমের জাত ভায়েরা তবু তাতেই তুষ্ট হয়ে এসেছে। কিন্তু সে পথেও এসেছে নতুন বাধা। কে জানতো দুনিয়া এভাবে বদলে যাবে!

ওর জাতের ছেলে-ছোকরারা বেশ কিছুকাল ধরেই এইসব কারণেই জাতের ধর্ম-কর্ম ছেড়ে সাফা আপিসে কাম নিয়েছে। ধাঙড়-কুলির কাম, ড্রেন সাফার কাম, ঝাড়ুদারের কাম। এসব তো ভাঙ্গিরা করে। এতো ওদের ধর্ম-কর্ম নয়। কিন্তু যুগ বদলাচ্ছে। দোসাদ, ভাঙ্গি, ডোম-চণ্ডাল সব একাকার হয়ে যাচ্ছে। কিসের ধর্ম? ওপরতলা থেকে নিচের দিকে কোথাও কোন মানুষ ধর্মের নামে আজকাল আর শুখা মরতে রাজী নয়। যুবকেরা পদমকে নতুন পথ দেখায়, নজর পালটাতে বলে। কিন্তু সনাতন ধর্ম ছেড়ে পদম অন্য কোন দিকে তাকাতে পারে না। জাতের মোড়ল হয়ে সে আন্‌খা কাম কী করে মেনে নিতে পারবে? পদম ছেলে-ছোকরাদের কাছে বহুবার শুনেছে সাফা আপিস, মানে মুনিশপাল্‌টি। ইসব কামে কুনো হাঙ্গামা নাই। জাদা কাম করো কি চাহি নাই করো, বাঁধা পয়সা, টাইম-মাফিক কাম, কামকে বাদ দিনভর ছুট্টি। খাও, পিয়ো আউর আরামসে জিয়ো।

পদম আরও দেখছে, দিনকে দিন বাজারে দাউ দাউ করে আগুন লাগছে। মালপত্রের দাম বাড়ছে। কাজকাম তো সেই তুলনায়

মিলে না। কবে কখন একটা মড়া শ্মশানে এল কি এলনা, কোথায় একটা কুকুর-শেয়াল মরল, তখন ওদের ডাক পড়ে। নামমাত্র মজুরী। আবার এই কাজ নিয়ে ওদের মধ্যে কাড়াকাড়ি। কত আর নিয়ম বাঁধা যায়। পেটের জ্বালা কোন নিয়ম মানে না। হরদম এই নিয়ে ওদের মধ্যে মন কষাকষি চলে। তার চেয়ে সাফা আপিসের কাম অনেক ভাল। তা বুঝেই ছেলে-ছোকরারা সেই দিকেই ঝুঁকেছে। দোষ দেবার কিছু নাই।

একসময় গেরস্তের ঘরে ঘরে ওদের বাঁধা ঝুড়ি-কুলোর খুব চাহিদা ছিল। আজকাল তাও নাই। এ কাজেও অন্য জাতের মানুষ নেমে পড়েছে। ফলে প্রতিযোগীর সংখ্যা বাড়ছে। ওদের কদরের দিন লোপাট হয়েছে। আগে গেরস্তের বাড়ি থেকে গ্রহণে দান করত, পাল-পার্বণে সিধে মিলত। আজকাল তাও বন্ধ হয়েছে। চারপাশ থেকে অবস্থা এমনই ঘোরালো হয়ে উঠেছে যে সত্যি সত্যি শুখা মরা ছাড়া অন্য কোন গতি নাই। পদম ছাড়া ওর জাতের প্রায় সকলেই সাফা আপিসে কিংবা অন্য সব কাজে লেগে গিয়েছে। অন্য কাজ মানে বেওয়ারিশ মড়া বানের জলে ভেসে এলে তা থেকে কংকাল ছাড়িয়ে চালান দেওয়া। এই কংকালের কাম শুধু বেআইনি নয়, ঘৃণ্য, ধর্মবিরুদ্ধ। মাঝেমধ্যে কেউ কেউ একামেও পয়সা লুটছে। এ কাম পদমের কাছে নীতিবিরুদ্ধ। ফলে, একমাত্র দোস্ত শুখরাম ছাড়া, জাত-ধর্মের কামে আর অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই।

তবে শুখরামের এখন সুখ বেড়েছে। কাজকাম কম করে। কারণ ওর একমাত্র বেটা রূপচাঁদ, বাইশ-চব্বিশ বছর বয়েস, সাফা আপিসের কাম করে, আর মাঝে মধ্যে কংকাল চালান দিয়ে দুটো পয়সার মুখ দেখেছে। ফলে, ইদানীং শ্মশানে মড়া এলেই পদমের ডাক পড়ে। পদম এখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী পতিতপাবন। পতিত পদমের এসব কথা মনে এলে হাসি পায়।

জাত-ধর্ম বজায় রেখে ওস্তাদ পদমচাঁদের দিন বেশ ভালই কাটছিল এতকাল। কিন্তু গরিব আদমির তো পোড়া নসীব, দুখের

ওড় নাই। হঠাৎ ফের এক নতুন উপসর্গ জুটেছে কোত্থেকে। এ এক ভয়ংকর উপসর্গ। এবার সবংশে নিধন হতে হয় বুঝিবা! টগরের শাদী নয়, এই নতুন উপসর্গ পদমকে খুব ভাবিয়ে তুলেছে। টগর সুন্দরী। ওর শাদীর জন্যে পদমের ভাবনা নাই। দোস্ত শুখরাম তো একপা বাড়িয়ে বসে আছে ওর বেটা রূপচাঁদের সঙ্গে টগরের শাদী দেবার জন্যে। শুধু পদম রাজী হচ্ছেনা। কারণ, বেটা রূপচাঁদ জাত-ধর্ম ছেড়ে মুনিশপালটির সাফা আপিসে কাম নিয়েছে। পদমের মনের মধ্যে এই একটা খোঁচ বিঁধে আছে। নচেৎ বেটা রূপচাঁদ জোয়ান মরদ, দেখতে মন্দ নয়। বিনি পয়সায় এমন পাত্র ক'জনের নসীবে জোটে! কিন্তু ওই খোঁচ! যদিও হালে একটা খবর লোকমুখে ওর কানে এসেছে। দোস্ত শুখরামের বেটা রূপচাঁদ নাকি নোকরি ছেড়ে কী একটা বেওসা শুরু করেছে। বেশ দু'পয়সা ঘরে আনছে। খেলোয়াড় লেড়কা! নোকরি ছেড়ে ডোমের বেটা হদ্দমুদ্দ ডোম কী এমন বেওসা করতে পারে। তাজ্জব কী বাত! তবে আন্‌খা কাম ছেড়েছে এটা পদমের কাছে খুব খুশখবর। জাতের বেওসা করলে তো কোন বাত নাই। লেকিন দোস্ত শুখরামের মুখ থেকে যতক্ষণ সে খবরটা না শুনছে, ততক্ষণ নিশ্চিন্দি হওয়া যায় না।

কিন্তু দোস্ত শুখরাম বেশ কদিন থেকেই বেপাত্তা। কারণটা ঠিক ঝোঝা যাচ্ছে না। এতবড় খুশখবর তো ওর মুখ থেকে শোনা দরকার। দোস্ত শুখরাম তো আগে দিনে দু'একবার আসত। আর এলেই টগরের সাথে ওর বেটা রূপচাঁদের শাদীর প্রস্তাব রাখত। দোস্ত জানত পদমের আপত্তির কারণ, তবু শুখরাম পাঁচ কথায় পদমের মন ভুলানোর চেষ্টা করত। সেই দোস্ত শুখরাম কোন খুশখবর নিয়ে আসছেনা কেন? কোথায় যেন একটা ধন্দ আছে। পদম ঠিক করল দোস্ত শুখরামের কাছে এবার সে নিজেই যাবে, খবরটা সাচ্চা হলে প্রস্তাবে রাজী হবে। এটা তেমন কিছু ভাবনার ব্যাপার নয়। পদমের ভাবনা আলাদা। দেশকাল রীতিকানুন যেভাবে তুরন্ত বদলে যাচ্ছে, তাতে তো ধন্দ জাগে ওকে বুঝিবা একদিন শুখা মরতে হবে। এ ছাড়া

গতি নাই। বেটি টগর তো খুব চালাক লেড়কী! ওর মুখ দেখে বেটি হয়ত কিছু আঁচ করেছে। তবে এবার সে মনে মনে তৈরী হয়ে উঠেছে। বেটির বিয়ে দিয়ে এই দেশ গাঁও ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে। এ ছাড়া ওর আর কী-বা আছে জীবনে?

পুরনো কথা মনে পড়ে পদমের। পঁচিশ সাল আগে তার শাদী হয়েছিল। সাত-আট সাল পেরিয়ে গেল, কিন্তু কোনো ছানাপোনা হল না বহুড়ির। মনে বড় দুখ ছিল দুজনার। একদিন পদম খুব বিহান বেলায় জলজঙ্গল পেরিয়ে কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে ঘরে ফিরছে। হঠাৎ কানে গেল দূরে জলার ধারে বাচ্চার কান্না। পদম কয়েক পা এগিয়ে দেখে আহা, কী সুন্দব ফুটফুটে ফর্সা একটা শিশু মা বসুন্ধরার কোলে শুয়ে শুয়ে কাঁদছে। দূব থেকে দেখলে মনে হয় যেন একটা টগর ফুল ফুটে আছে। মা বসুন্ধরা এই বাছাকে পেল কোথায়? নাকি কেউ ওকে ফেলে পালিয়েছে? মনে হয় কোন খানদানী ঘরের বাচ্চা. কিছুক্ষণ আগেই ভূমিষ্ঠ হয়েছে। হয়ত বড় ঘরের শরম ঢাকার জন্যেই এই অপকর্ম। মানুষ কত বড পাষণ্ড আর খুনী হতে পারে এটা তার নমুনা। পরম আদরে পদম বাচ্চাকে কোলে নিয়ে এসে বহুড়ির হাতে তুলে দিয়েছিল। ফুটফুটে ফর্সা বাচ্চাকে পেয়ে বহুড়ির আর আনন্দ আহ্লাদ ধরে না। কোথায় বাচ্চাকে রাখবে এই দুর্ভাবনায় বহুড়ি তখন মত্ত। এই হল সেই টগর।

টগর দিনে দিনে পদমের ঘরে বড় হয়ে উঠতে লাগল। এই ঘটনা দোস্ত শুখরাম জানে, জানে আরও অনেকেই। সব জেনেশুনে শুখরাম টগরকে তাব লেড়কার সাথে শাদী দিতে চায়, কারণ টগর অপূর্ব সুন্দরী। এমন লেড়কী বেটার বহুড়ি হয়ে ঘরে এলে ভাঙা ঘর আলো হয়ে উঠবে। কিন্তু হঠাৎ সেই শুখরাম কদিন থেকে আসছে না দেখে পদমের মনটা কেমন আনচান করে উঠল। কোথাও কিছু অগড়-বগড় ঘটল নাকি! পদম উঠে পড়ল। দোস্ত শুখরামের কাছে এখুনি যেতে হবে। আজই ব্যাপারটা ফয়সালা করে ফেলবে সে।

এমন সময় ঝোপজঙ্গল পেরিয়ে লকড়ী কুড়িয়ে ঘরে ফিরছে টগর।

পদমের বহুড়ি বছর পাঁচেক হল গত হয়েছে। টগর খুব আছাড়ি-পিছাড়ি কেঁদেছিল মায়ের জন্যে। বছর কয়েক পদম মেয়েকে কিছুই করতে দেয় নি। নিজের হাতে সব কাজ করত, রসুই বানাত। ইদানীং টগরই সব কাজ করে। ঘর সংসার দেখে, ঝুড়ি-কুলো বানায়, হাটে মাল বিক্রী করে পয়সা আনে। এ-কদিনে বেশ কিছু পয়সাকড়ি জমিয়ে ফেলেছে টগর। খেতুরের মেলায় প্রচুর মালপত্র বিক্রী হয়েছে। সেই টাকায় নিজের আর বাপের জন্যে জামাকাপড় কিনেছে। চাল ডাল তেল লবণ লঙ্কা আলু পেঁয়াজ কিনে ঘব ভর্তি করে রেখেছে। আজ খুশীমত রসুই পাকাবে, বাপ-বেটিতে আরাম করে বসে খাবে। এমন সময় বাপকে কোথায় যেতে দেখে টগরের মনটা বড় বেজার হয়ে উঠল।

টগর বলল, এই বেটাইমে তুমহি আখুন কুথাকে যেছো বাপু? আভি তো খানে-পিনেকা টাইম, বাহার যানেকা কেয়া জরুরত হ্যায়?

পদম বলল, জলদি ফিরত আসব বেটি। তুর রসুই বানানোর আগেই ঘুরত আসব। তু ঘরকা কাম শুরু কর্ দে—

—হামার একেলি ঘরমে থাকতে বহুত ডর লাগে।

—ইয়ে কেয়া বাত হ্যায় বেটি! চান্দিকে একা এত ঘুরিস্, তুর ডর লাগবে কিসের লেগে, আউর ইধর কুনো ঝুট ঝামেলা তো নাই। তারপর একটু থেমে টগরের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, ডোম-চণ্ডাল কো লেড়কী ইস দুনিয়ামে কিসিকো নহী ডর্‌তি।

—উসব আন্‌খা বাত ছোড়্ দো বাপু। এই দেশ-দুনিয়াকা হাল-চাল তুমহার কুছু মালুম নাই। হামি হাটে-বাজারে মেলায় ঘুরে সব সমঝ গিয়েছি। আভি বোলো, তুম কাঁহা যা রহে হো? ঝুটমুট ছোড়্‌কে সচ বাত বোলো—

পদম হেসে বলল, তুর বাপতো বুডঢা হয়ে যেছে, আখুন তুকে তো সব সমঝাতে হবে। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বলল, ডরো মাৎ, হামি দোস্ত শুখরামের সাথে ভেট করে একটা ফয়সালা চুকিয়ে জলদি ফিরত আসব।

—কিসের ফয়সালা?

—তুকে সব পরে জানাব। তু যখুন সব সমঝাতে শিখেছিস, তখুন তো হামার বাত সব সমঝাতে পারবি। তু হাটে-বাজারে গিয়ে বেশ চোস্ত আওর চালু হয়ে গিয়েছিস।

—কী সমঝাবো? এই দেশ-গাঁওকা কুছু ছোকরা বেচাল বেলেল্লা হয়ে উঠেছে। তুমহার কাছে গেরস্ত মেয়ে-মদ্দরা মাল পত্তর কেনেনা ক্যানে? যত দিন যেছে ততই সবাই আরও জাত-বেজাতের কথায় মেতে উঠেছে ক্যানে? হামার কাছে শুধু মদ্দরা ভিড় করে আসে ক্যানে? তখুন বেজাতের ছোঁয়ায় বাবুদের জাত-ধর্ম যায়না ক্যানে? হামি বাজারে গেলে জোয়ান মদ্দরা ঘিরে ধরে মাল যাচাই করার খেল দেখায়, হামকো লিয়ে মস্করা করে, গায়ে ঢলে পড়ার মতলব আঁটে, ঘরের বৌ-ঝিরা হামার নামে গালি পাড়ে। কুলো ঝাড়ি ইসব মাল তো ঘরের বৌ-ঝিরা পসন্দ করবে, লেকিন তারা হামার নামে গালি পাড়বে ক্যানে? হামি নাকি তাদের ঘরে আগ্ লাগাতে যাই। ইবারের খেতুরের মেলায় যেয়ে হামার বহুত গুনাহ হয়েছে।

—হ্যাঁরে বেটি, তু হামাকে তো ইসব কুছু বলিস নাই। পদম চঞ্চল হয়ে ওঠে।

—কেয়া ফয়দা? তুমহি কতি যেছো যাও, লেকিন জল্দি ফিরবা।

—হামি সমঝ গিয়েছি, মেলায় গিয়ে তুর বহুত তকলিফ হয়েছে। তু আর হাটে বাজারে যাসনা বেটি। হামাদের নসীবে যা জুটবে তা হবে।

—হামি জেনে গিয়েছি দুষমনেরা তুমহাকে কাম থেকে হাঁকাতে চাহাছে। তো হামি বাজারে না-গেলে যে দু'জনাকে শুখা মরতে হবে।

কথাটা ঠিক। সব জেনেশুনে পদম সোমত্ত মেয়েটাকে বাজারে পাঠায়। দু'একজন সদাচারী আদমি এ-ব্যাপার নিয়ে কয়েকবার ওর কাছে নালিশও করেছে। কিন্তু নিরুপায় পদম সেসব কথা কানে তোলেনি। কারণ সত্যি সত্যি পদমকে সাত পুরুষের জাত-ধম্মের

কাজকাম থেকে ধীরে ধীরে হটে আসতে হচ্ছে। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল ওর জাত ভায়েরা আর প্রতিযোগী নয়। এবারের প্রতি-যোগী হল উঁচু জাতের খানদানি আদমি। ঘোর কলিকাল বটে! কে কবে শুনেছে উঁচুজাতের তবিলদার আদমি ডোমের হাতের কাজকাম ছিনিয়ে নিয়ে বেওসা করে!

পদম টগরের দিকে তাকায়। বড় চালাক লেড়কী। পদম তো কিছুই বলেনি টগরকে। সে এসব আঁচ করল কী করে! পদম বলল, গরিব আদমিব ওপরওয়ালা আছেরে বেটি।

টগর বাপের কথায় হেসে উঠল। ওর হাসিতে চারপাশের বনভূমি যেন আলো হয়ে উঠল। টগর বলল, উসব ঝুটমুট বাত। গরিবেব কেহু নাই বাপু।

—নারে বেটি, সাচ বলছি, গরিবের ভগবান আছে। তারপর একটু থেমে পদম বলল, দীনদুনিয়ার মালিকের দয়ায় তুর শাদী হয়ে গেলে হামার নিশ্চিন্দি। তখুন এই দেশ-গাঁও ছেড়ে অন্য কুথাও কাম লিয়ে চলে যাব। তুরা এই ঘরে থাকবি, হামি ছুট্টি লিয়ে বেড়াতে আসব।

টগর এবার খিলখিল ক'রে হেসে উঠল।

পদম বলল, কীরে বেটি, হাসছিস ক্যানে?

—বলিহারি শখ বাপু! তারপর টগর হাসি থামিয়ে বলল, তা কুথাকে যাবে!

—যিস দেশমে আঁখো কী নজর যাবে সেখানে গিয়ে কাম করব।

—বহুত আচ্ছা। লেকিন কুথা ভি ঠাঁই মিলবে না, কাম মিলবে না। তামাম দেশের হাল এক কিসিম হয়ে গিয়েছে, সমঝাতে পারো না?

পদম অবাক হয়ে যায় টগরের কথা শুনে। বেটি এতসব বুঝল কী করে! ঘরের বাইরে বেরিয়ে, মানুষজন হাটবাজার দেখে চালাক লেড়কী সব কথা বুঝে ফেলেছে। পদম বলল, ইয়ে তো ঠিক বাত হ্যায় বেটি। তু বহুত চালাক হয়ে গিয়েছিস।

টগর বাপের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমহাকে কুথাভি যেতে দিব না, আউর হামিও বাপুকা ঘর ছোড়কে কুথাভি যাবে না। ইয়ে হ্যায় হামার সাফ জবাব।

—ঠিক আছে, তো তাই হবে। তুর শাদী হলে এই ঘরেই থাকবি, হামি বাহার মে বারান্দায় নিদ্ যাবো। তা ভাবছি দোস্ত শুখরামের সাথে আজ একটা পাক্কা ফয়সালা করে আসি। দোস্তকা বেটা রূপচাঁদ তো আচ্ছা লেড়কা হ্যায়।

টগর রুখে দাঁড়িয়ে বলল, না, স্রেফ যাবা না। হামি শুনেছি উয়ো তো নোক্‌রী ছোড়কে বহুত বদমাস ইয়ার দোস্তের পাল্লায় পড়ে আজকাল কী সব আন্‌খা কাম জুড়েছে। ভাল কাম না-করলে হামি কিছুতেই উয়াকে পসন্দ করতে পারব না। উসব বাত ছোড়্ দো বাপু।

এমন সময় যণ্ডামার্ক গোছের দুটি ছোকরা পদমের ঘরের সামনে এসে হাজির হল। ওদের কুৎসিত গালপাট্টা, মাথায় কাকবাসা বাবরী, পরনে সস্তাদরের প্যাণ্ট, গায়ে রঙ চঙে গেঞ্জি, পায়ে চপ্পল। নন্দকিশোর সরকার এমন কতজন সবল প্রাণী পুষে রেখেছেন বলা শক্ত। পদম এই সব কাগাবগাদের চিনে জেনে গুণে শেষ করতে পারে না। প্রায় সকলের চেহারা ও পোশাক একই রকম ঠেকে ওর কাছে। ওদের নাম, কথাবার্তা, চালচলন দিনেরাতে বদলায়। এই হাড়গিলে প্রাণীদের দেখলে বড় ভয় করে পদমের। এই পৃথিবীতে ভগবান যে কতরকম জীব সৃষ্টি করেছেন! ওদের একজনের নাম ঢ্যাং, আর একজনের নাম হুলো। ওরা দু'জনেই পদমের সামনে এসে দাঁড়াল।

হুলো বলল, তোর মালিক কদিন থেকে তোকে তলব করছে, ভেট করছিস্ না ক্যানে?

পদমের সারা শরীর রি-রি করে জ্বলে উঠল। তবু সে চুপ করে রইল। কে কার মালিক? ওপরওয়ালা ছাড়া ওর মালিক আর কে আছে? সে তো কারও কেনা গোলাম নয়! সে কার হুকুম তামিল করবে? তবু এসব কথা সে উচ্চারণ করতে পারে না।

ঢ্যাং বলল, কীরে ব্যাটা, গলায় বোল ফুটছে না ক্যানে? ভিজে বিড়ালের মত হেঁটে যাবি, না তুলে নিয়ে যাব?

হুলো বলল, দেখে মনে হচ্ছে ভাঁড়ে মাল ঢেলে খেতে শেখেনি!

ঢ্যাং অঙ্গভঙ্গি করে একটা খিস্তি করল, বলল, যা বলেছিস্ মাইরি!

হুলো বলল, আবে, অ্যাই শালে! রা কাড়ছিস্ না ক্যানে? কী হল? কানে কলা ঢুকেছে? শুনতে পেছিস্ না?

হঠাৎ কোত্থেকে সেখানে রূপচাঁদ এসে হাজির হল। রূপচাঁদের বলিষ্ঠ দেহ, মজবুত গডন, দুর্ধর্ষ সাহস। ওর পরণে আঁটো সাঁটো প্যাণ্ট, গায়ে আঁটো জামা, পায়ে চপ্পল। সে ওদের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে বলল, বাপের মতুন আদমির সাথে ক্যায়সে বাত বলতে হয় জানিস না বেতমীজ কাঁহিকা? চলা হট্ হিঁয়াসে। মন চাইলে সরকারের সাথে খুশী হয়ে উনি ভেট করবেন, না হলে করবেন না।

হুলো বলল, এর মধ্যে তুমি আবার নাক গলাছো ক্যানে গুরু? তোমার তো আলাদা ডিপার্টমেণ্ট্, তুমি বে-লাইনে চলে যেছো।

রূপচাঁদ বলল, লাইন দেখাবি না হুলো, তুর চেয়ে লাইন হামি ভাল বুঝি। আওয়াজ না-দিয়ে ইখান থেকে সিধা রাস্তা ছ্যাখ।

ঢ্যাং বলল, সেম্‌সাইড হয়ে যেছে মাইরি, ফল কিন্তুক ভাল হছে না।

—চোপ্! রূপচাঁদ রুখে দাঁড়াল, বলল, ফের বলছি সিধা রাস্তা ছ্যাখ, নাহলে লাশ পড়ে যাবে।

হুলো আর ঢ্যাং দু'জনেই কিছুটা পিছু হটে গেল। ওরা জানে রূপচাঁদ ভয়ানক দুর্ধর্ষ। যে-কোন লোককে সে যখন তখন মুড়িমুড়কির মতন মায়ের ভোগে তুলে দিতে পারে। এসব কাজে ওর জুড়ি পাওয়া ভার। সামনা সামনি ওকে কাবু করা বেশ শক্ত। পিছু হটে যাবার সময় ওরা জানিয়ে গেল যে ওদের কাছেও সব সময় মশলা মজুত থাকে। এভাবে কুত্তার মতন ওদের খেদিয়ে দেবার জন্যে ওকেও ফল ভোগ করতে হবে। কারণ রূপচাঁদ যদি গোটা দুনিয়াকে ওর কেনা

গোলাম কিংবা পোষা কুত্তা ভেবে থাকে তো ভুল করেছে। সে ভুল জলদি ভেঙ্গে যাবে। ওরা দূর থেকে রূপচাঁদকে এসব বুঝিয়ে দিল।

রূপচাঁদ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না-করে পদমের দিকে তাকিয়ে বলল, কুছু দরকার হলে হামাকে তল্লাশ করবেন, হামি ওদের ঠাইট্ দিতে জানি। ইসব উল্লুকের বাচ্চাকে টাইট দিতে হামার বাঘের বাচ্চা আছে। আপনা খুশীসে চলবেন, কুছু ডরাবেন না।

রূপচাঁদ আর এক মুহূর্ত না-দাঁড়িয়ে হন্‌হন্ করে চলে গেল।

পদমের ইচ্ছা হয়েছিল রূপচাঁদের সঙ্গে এই ফাঁকে কিছু কথা বলে নেবে। নন্দকিশোর সরকার যেভাবে ওকে শ্মশান এলাকা থেকে সরিয়ে দিতে চাইছেন, ওর পোষা মাস্তানের দল যেভাবে দিনের পর দিন পদমের ওপর হামলা চালাচ্ছে—সব কথা বলবে। হয়তো রূপচাঁদ এসব কিছুই জানে না। তাছাড়া রূপচাঁদ আজকাল নোকরি ছেড়ে কী বেওসা জুড়েছে তাও জেনে নেবে। কিন্তু কিছুই বলা হল না। রূপচাঁদ ওকে কিছু বলার সুযোগ না-দিয়ে তুরন্ত উধাও হয়ে গেল।

সে এখন ঠিক করল, দোস্ত শুখরামের সঙ্গে এই মুহূর্তে জরুর ভেট করতে হবে। রূপচাঁদ তো খুব খারাপ লেড়কা নয়! ও এসে না পড়লে আজ বহুত ঝামেলা বাধত। পদমের শির উঁচা থাকত না। দুই বেতমীজ পদমকে জোর করে সরকারের কাছে ধরে নিয়ে যেত। পদম স্থির করল, সে এবার সরকারের সঙ্গে ভেট করবে, ওর মতলব জেনে নেবে, একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলবে। তারপর সব কথা রূপচাঁদকে জানাবে। ওর আর কোন ডর নাই। রূপচাঁদ সাহসী জোয়ান লেড়কা। পদমের পাশে সে দাঁড়ালে ওপরওয়ালার দয়ায় এই বুড্ঢা বয়সে ওর তো আর কোন ভাবনা থাকবে না। টগর যাই বলুক, পদম জানে গরিবের ভগবান আছে। শ্মশান কালীমায়ী এখনও জাগ্রত আছেন।

পদম দেখল টগর খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। পদম বলল, কী হল রে বেটি, অত হাসছিস ক্যানে? রূপচাঁদের বাত শুনে হাসছিস নাকি?

টগর হাসতে হাসতে বলল, তুমহার দোস্তের বেটা বড় উস্তাদ হয়ি গিয়েছে। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, উয়াকে একটুক হুঁসিয়ার করে দিবা বাপু, তা না হলে ওই বেতমীজ উল্লুকদের পাল্লায় পড়ে বাঘের বাচ্চার জান খতম হয়ে যাবে।

—ঠিক বাত বেটি, আগে দোস্তের সাথে ভেট করে কুছু বাত পুছে লিই। তু রসুই বানাতে থাক, হামি দোস্তের তলাশ করে জলদি ফিরতে আসব।

পদম আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না-করে দোস্ত শুখরামের সাথে ভেট করার জন্যে ওর ঘরের দিকে এগিয়ে চলল।

দোস্ত শুখরামের ঘর বেশী দূরে নয়। আকন্দ, আশ-শেওড়া, বাঘভেরেণ্ডা, কালকাসুন্দে, কুকসিমে, ছাগলবঁটি আর নলচিতার বনঝোপের ওপারে দোস্ত শুখরামের ঝুপড়ি। দোস্তের ঝুপড়ির সামনে ধুতরো আর কল্কেফুলের বাহার। বাপ-বেটায় বেশ সুখেই আছে দু'জন। গত সনে দোস্তের বহুড়িব বিমার হয়েছিল। ডাক্তার-বদ্যি ডেকে সূঁই দিয়ে অনেক চেষ্টা করেছিল দোস্ত. কিন্তু বাঁচাতে পারেনি। সে গত হয়েছে। তারপর থেকে যে কী হল কে জানে! বেটা রূপচাঁদ বাপের হাতে কিছু টাকা ফেলে দিয়ে কোথায় যে উড়ে বেড়ায়, তা শুখরামের ঠাহর হয় না। মুনিশপালিটির আপিসে ধাঙড় সর্দার হয়েছিল লেড়কা। শুনেছে সে কাজেও নাকি ইস্তফা দিয়ে সে কী সব বেওসা জুড়েছে। তা টাকা আনছে ঠিক, নেশাভাঙও করে না, কিন্তু বাপের মন আনখা বেওসায় সায় দেয় না। শুখরাম মনে করে গরিব ডোম চণ্ডাল ধাঙড় আদমি, নোকরি জুটেছে তো বেটা মাথায় করে রাখ। দরমাহা তো মিলছে! বেশী লোভ করবি না। কিন্তু আজকালকার ছোকরা, বহুত খাঁই, উচা হাঁকডাক, বেতমীজদের পাল্লায় পড়লে নজর ভি নিচা হতে কতক্ষণ! পদমের কানে এসব কথা গেলে সে লেড়কার সম্বন্ধে কী ভাববে!

শুখরামের তাই এসব ভাল লাগে না। সে দু'একবার লেড়কাকে মিঠে সুরে এসব বাত বোঝাতে চেয়েছে। কড়া কথা বলতে পারে না

শুখরাম। মা-মরা লেড়কা তো, শুখরামের বুকে বড় দরদ লাগে। কিন্তু বেটা রূপচাঁদ বাপের কথায় তেমন আমল দেয়নি। তাই শুখরামের ইচ্ছা, বেটার শাদী দিলে, ঘরগেরস্তালি করলে দেওয়ানা রূপচাঁদ শুধরে যাবে। পদমের লেড়কী টগরকে ওর খুব পছন্দ। রূপচাঁদের সঙ্গে শাদী হলে জুটি মানাবে ভালো। শুখরাম জানে টগর যদিও পদমের কুড়িয়ে পাওয়া লেড়কী। কিন্তু তাতে কীবা আসে যায়! টগর যেমন পয়মন্ত, তেমনি খুবসুরত। টগর বেটা রূপচাঁদের বহুড়ি হয়ে এলে ঘরে রোশনি জ্বলবে, শুখরামের হররোজ বসুই বানানোর তকলিফ থাকবেনা, লেড়কা ভি জবর শায়েস্তা হয়ে যাবে। টগর বহুত হিসাবী লেড়কী। শুখরাম চারতরফ দেখেশুনে ভেবেচিন্তে মন স্থির করেই পদমের কাছে রোজ ধর্না দিত। পদম একবার রাজী হয়ে গেলে শুখরামের আয়েস রোখে কে? ওর বিশ্বাস, লেড়কার শাদী হলে ঠিকসে কাম করবে, ইয়ার দোস্ত সব ছুটে যাবে।

এসব কথা শুখরাম দিনের পর দিন ধরে পদমকে জানিয়েছে। শুখরাম মনের সব কথা একমাত্র দোস্ত পদমকে বলেই শান্তি পায়। বহুড়ি মারা যাবার পর শুখরাম তো রোজ পদমের কাছে এসেছে শুধু লেড়কার শাদীর জন্যে। ওর লেড়কা তো যেমন জোয়ান, তেমনি খাটিয়ে।

কিন্তু পদম শুখরামের কথায় এতদিন আমতা আমতা করেছে, কোন পাকা কথা দিতে পারে নি। কারণ পদম মনে করে, ডোমের লেড়কা জাত-ধর্মের বেওসা করবে, মুনিশপালটির আপিসে ধাঙরগিরি তো ওদের কাম নয়। ইসব কাম করলে ইজ্জত নষ্ট হয়ে যায়।

শুখরাম পদমের কথায় আপত্তি জানিয়েছে। কারণ, ইসব পদমের আনখা বাত। আরে বাপু, কিসের জাত-ধর্ম? পদম কী জাত-ধর্মের কাজকাম করে ভুখ মিটাতে পারছে? ওর ওপর কী উট্‌কো আদমিরা জুলুমবাজী করছে না? উট্‌কো আদমিরা মোটা দাঁও মারার তালে কী পদমের কাজকামে হাত বাড়াছে না? বাবু সাহাবদের লেড়কারা ডোমের বেটা রূপচাঁদের সঙ্গে থোড়া ফিকির নিয়ে কী দোস্তি পাকাছে না? জাত-ধর্ম কেবা তখন মানছে? লেকিন এমন আমল

ছিল যে ডোম হেঁটে গেলে উঁচা হাতের আদমিরা রাস্তায় গঙ্গাপানি না-ছিটিয়ে পথে নামত না। আর এখন কে মানছে বামুন-ডোম? আভি আসলি চীজ্‌ হ্যায় রূপিয়া!

এসব কথা বহুবার শুখরাম পদমকে বুঝিয়ে বলেছে। কিন্তু পদম সেই একই ভাবে আমতা-আমতা করে চুপ মেরে থেকেছে।

শুখরামের মাঝে মাঝে গোঁসা হয়েছে, বলেছে, আরে বাপু, জাত-ধরম শিবে লিয়ে কি শুখাভুখা মরবে? দেখো ভাইয়া, হামরা তো হদ্দমুদ্দ ডোম, বাবুলোগ সুহাগসে কহতা হ্যায় হরিজন, লেকিন কাম তো নহী মিলতা। জো কুছ্‌ কাম কাভ কভি মিলতা, সো বাবুলোগ ঠিকসে মজুরী ভি নহী দেতা। তো তুমলোগ ক্যায়সে জিয়োগে? পহেলী বতাও তুমকো কেয়া মতলব হ্যায়?

কথাটা ঠিক। পদম মেনেছে শুখরামের যুক্তি। শুখাভুখা মরার চেয়ে নোকরি কিংবা যে-কোন কাজ ভাল। বেঁচে থাকতে গেলে যুগের সাথে, জিন্দেগীর সাথে আপোস করে চলতে হবে। খুব দামী কথা। বেঁচে থাকলে তবে তো জাত-ধর্ম! মৃত্যু কোন জাত-ধর্ম মানে না, নিদানকালে সে এসে হাজির হবেই। সুতরাং যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। বেঁচে থাকাই বড় ধর্ম। সবই খুব খাঁটি কথা। যেমন করেই হোক দানাপানি দিয়ে প্রাণ বাঁচাতে না-পারলে ধর্মও মিথ্যা হয়ে যাবে। এর জন্যে চাই রূপিয়া। সবই ঠিক। তবুও রূপচাঁদের ধাঙড় সর্দারের নোকরিকে পদম এতকাল মনে মনে ঠিক মেনে নিতে পারে নি।

কিন্তু, ইদানীং শোনা যাচ্ছে রূপচাঁদ সেই নোকরি ছেড়ে দিয়ে কী সব বেওসা জুড়েছে। জাত-ধর্মের বেওসা হলে তো কোন কথাই নাই। কিন্তু হালফিল দোস্ত শুখরাম ওর কাছে আসছে না কেন? বেওসা পছন্দ নয় বলে কি শুখরাম বেটা রূপচাঁদকে ঘর থেকে ভাগিয়ে দিতে চায়? সে এই কারণে কি লেড়কার শাদী দিতে নারাজ? তাহলে তো পদম রূপচাঁদকে ঘরে ঠাঁই দিবে আর দোস্ত শুখরামকে আজই সে শুনিয়ে দিয়ে আসবে, হামরা হদ্দমুদ্দ ডোম তো বটে!

জাতের বেওসা ছাড়া আনখা কামে নজর দিবার কী দরকার? ধর্ম বলে তো একটা বাত আছে, ওপরওয়ালা জাত-ধর্ম কাজকাম সব ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিয়েছেন। তাঁর হুকুম বাতিল করলে ধর্মে সইবেনা দোস্ত।

পদম এসব কথা ভাবতে ভাবতে শ্মশান এলাকার কাছাকাছি এসে হাজির হল। চারপাশে বনঝোপ, বড়বড় বট ও শেওড়াগাছ। দূরে মেথর পাড়া। এধারে দু'তিনঘর মাত্র ডোম-চণ্ডালদের বাস। শ্মশানের উপর কালীমন্দির, মধ্যিখানে বিশাল চত্বর। অদূরে শবদাহের স্থান। পাশে বহমান ভাগীরথী।

পদম শ্মশানের কাছাকাছি দোস্ত শুখরামের ঘরের সামনে গিয়ে দেখল, শুখরাম ঘরে নাই। বেটা রূপচাঁদও নাই। অগত্যা পদম নিজের ঘরের দিকে ফিরবে ঠিক করল। এমন সময় সেখানে কোত্থেকে এসে হাজির হল হুলো আর ঢ্যাং। অসহায় পদম ওদের দু'জনকে এখানে দেখে বেশ চমকে উঠল।

ঢ্যাং বলল, এবার শালা পালাবি কুথায়? চল্ সরকারের কাছে, হারামখোর কোথাকার—

হুলো বলল, ব্যাটা আমাদের পিছনে পাল্টা মাস্তান লেলিয়ে দিতে চাইছে। শালা শয়তান, খোদার ওপর খোদগিরি? সরকারের হুকুম নড়চড় হলে চোপা নাড়া বন্ধ করে দিবো, থোবড়া খুলে নিবো, একদম সাবাড় করে দিবো। চল্ ব্যাটা এখন হুম্‌দো বুড্ঢা, নাহলে তোর লাশ ফেলে দিবো।

পদম বলল, চলিয়ে, হামি তো যেতে গররাজী হই নি।

ঢ্যাং বলল, তাহলে শালা এতক্ষণ ন্যাকড়া-বাজী করছিলি ক্যানে?

পদম কথাটা ঠিক বুঝতে না-পেরে ফ্যালফ্যাল করে ওদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, হামি তো বাজীকর নই, গরিব ডোম-চণ্ডাল আদমি, হামি তো কুছু ভেলকি জানি না।

ঢ্যাং বলল, এই হুলো, এ শালা বহুত বড়িয়া খোঁচর আছে

মাইরী! এ ব্যাটার অন্য কোন মতলব আছে! শালাকে ছু'চার ঘা রদ্দা দিবো নাকি?

হুলো বলল, দাঁড়া থাম, একটু রয়েসয়ে। এর পিছনে আবার হারামী রূপচাঁদ শালা আছে। খামোকা ঝামেলা বাড়িয়ে কী ফায়দা হবে! আগে তো সরকারের কাছে নিয়ে চল, তারপর শালার গুষ্টি-সুদ্ধকে ঠাণ্ডা করার মতলব ঠিক করা যাবে।

ঢ্যাং বলল, কিন্তু এ শালাতো হিলতে চায় না মাইরী। বল্তো তুলতাই করে নিয়ে যাই। কেমন বেগড়বাঁই জুড়েছে ছাখ!

পদম অবাক হয়ে যায় ওদের ভাষা শুনে। সাতপুরুষ ধরে ওদের বাস এখানে। পুরুষানুক্রমে ওদের কথাবার্তায় অশুদ্ধ হিন্দীর একটা দেহাতী টান থাকলেও, আসলে ওরা বাংলা ভাষাতেই চিবকাল কথা বলতে অভ্যস্ত। কিন্তু বাপ-পিতেমোর আমল থেকে তো এমন ভাষা পদম শোনেনি কখনও। দিনকালের সঙ্গে সঙ্গে কি সবই বদলে যাচ্ছে রাতারাতি? ভাষা, চালচলন, ব্যবহার সবই যেন দিনকে দিন রসাতলে চলে যাচ্ছে! আজ ভোর থেকে এসব কথাই ওকে বড্ড ভাবিয়ে তুলেছিল।

হুলো বলল, এই যে বুড়ঢা, আর চোপা না-নেড়ে কচি পাঁঠার মত এগিয়ে চল্তো বাপ্! আর আমাদের কথা, কি সরকারের কথা যদি লিক্ করে দিস্তো, তোকে মায়ের ভোগে তুলে দিবো। শালা রূপচাঁদ তোকে জিন্দা রাখতে পারবে না। সমঝা মেরা বাত? চল্ শালা, এগিয়ে চল্—

অগত্যা পদম ওদের সঙ্গে সরকারের ডেরার দিকে এগিয়ে চলল।

* * *

শ্মশান এলাকা। শহর থেকে মাইল দুয়েক দূরে। চারপাশে ঝোপঝাড়, বনজঙ্গল। গাছগাছালি ও লতাপাতায় ঘেরা এই অঞ্চলের আকাশে বাতাসে মাটিতে বুনো সোঁদা গন্ধ। দূরে মেথর পাড়া। এপাশে ডোম-চণ্ডালদের বাস। দিনের বেলায় মেয়ে-মদ্দ কেউ ঘরে থাকে না। সবাই কাজকামে বেরিয়ে পড়ে। সাঁঝ ঘনিয়ে এলে

ঘরে ফেরে, রসুই পাকায়, তারপর খানাপিনা সেরে নিদ যায়। ফলে রাতভোর, দিনদুপুর এ-তল্লাট প্রায়ই নিঝুম থাকে। হলফ করে বলা যায় এন্তেকাল না-ঘনালে এই জনমানবশূন্য অঞ্চলে শখ করে আগে কেউ বেড়াতে আসত না। তবে আজকাল আসছে। কারণ শ্মশান-কালী নাকি জেগে উঠেছেন! কালীমায়ীর সাথে সাক্ষাৎ মিলেছে এমন এক হিম্মতওয়ালা সাধুবাবাও ইদানীং মন্দিরে এসে জুটেছেন। শোনা যায় নন্দকিশোর সরকার নাকি সাধুবাবার তল্লাশ পেয়েছিলেন। তা পেতেই পাবেন। কারণ নন্দকিশোর তো বড় গোলদার মহাজন আদমি, মানীগুণী পুণ্যিবান লোক। তার মতো পুণ্যিবান লোক না-পেলে কী হদ্দমুদ্দ ডোম পদম সাধুবাবার তল্লাশ পাবে? বহুকাল তো মন্দিরে কোন পুরুত বামুন ছিল না।

শোনা যায়, সাত কি সতেরো পুরুষ আগে কে জানে, এই শ্মশান-কালী নাকি ডোমেরাই প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেই থেকে নাকি বছরে বছরে তারাই পুজো চালিয়ে যেত। তখন ওদের জাতের কী রবরবা! তারপর একবার মড়ক লাগল, ওদের জাতের লোকজন কিছু সাবাড় হয়ে গেল। বান এল, কিছু গেল। আকাল এল। বাদবাকী যা ছিল তা প্রায় সবই মুছে গেল। টিমটিম করে টিকে রইল মাত্র দু'-চার ঘর। হয়ত কিছু গুনাহ ছিল ওদের। ফলে কালীমায়ীর মন্দিরের পুজো ওদের হাতছাড়া হয়ে গেল। বরং বলা যায় ওরা নিজেরাই পুজো থেকে সরে দাঁড়াল। কারণ ওরা খাটো জাত। হয়ত কালীমায়ীর পুজোয় কিছু গুনাহ করে ফেলেছে। তাই ওদের জাত সব সাবাড় হয়ে গেল। এই একটা ভয় মড়কের মত ওদের জাতের মধ্যে চালু হয়ে গেল। ওরা কেউ নিজেরা আর ইন্তিজাম করে কালীমায়ীর পুজো দিবে না। দূর থেকে শুধু ভক্ত হিসেবে মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করে গুনাহ কাটাবে। সেই সাত কি সতেরো পুরুষ ধরে ওদের মধ্যে শুধু ভয় নয়, এই বিশ্বাসও চলে আসছে।

অবিশ্যি এই ভয় বা বিশ্বাস আকাশ ফুঁড়ে আসেনি। ওদের পূর্বপুরুষ অনেকেই সচক্ষে নাকি বহু ঘটনা দেখেছে। সেই সব ঘটনা

কাহিনীর আকারে পল্লবিত হয়ে পুরুষানুক্রমে ওদের মধ্যে চালু হয়ে আসছে। এমন বহু ঘটনা কাহিনীর আকারে ওদের জাতের ঘরে ঘরে চালু আছে। ঘর ভেদে যেমন কাহিনীর রকমফেরও আছে, তেমনি সবগুলো কাহিনীর মধ্যে একটা অন্ত্যমিলও আছে।

পদম ছেলেবেলায় এমন একটা কাহিনী শুনেছে। পদমের বাপ-পিতেমো জানত সেসব কথা। সাত কি সতেরো পুরুষ, কতকাল ধরে ওদের ঘরে এ-কাহিনী চালু হয়ে আসছে, পদম অতশত সব খতিয়ে দেখেনি। তবে অল্পবয়সে দাদীমার কাছে এ-কাহিনী শোনার পর থেকে পদমের মনে কোথায় যেন আজও একটা খটকা বিঁধে আছে।

শোনা যায় আগে পুরুত বামুন ডেকেই নাকি কালীমায়ীর পূজো দেওয়া হত। তারপর কোনো এক মোগল বাদশাহের আমলে নাকি বামুনেরা ধর্ম-ইজ্জতের ভয়ে দেশছাড়া হয়ে কিছুকালের জন্যে দিক-বিদিকে চলে যায়। সেই সময় কোনো এক চণ্ডাল বাধ্য হয়ে নিজেই কালীমায়ীর পূজো করত, মন্ত্রপাঠ করত। সে সূরয আর গঙ্গামায়ীর পূজো করত। লোকজন ভক্তিভরে প্রণাম করে প্রসাদ নিয়ে যেত। তখন ডোম-চণ্ডালদের সে এক জৌলুসের যুগ বটে! তারপর কোত্থেকে কী হল কে জানে, তাজ্জবের কথা বটে! হঠাৎ একদিন দেখা গেল সেই চণ্ডালের ধড় আর শির খাঁড়ার কোপে কালীমায়ী আলাদা দু'খণ্ড করে দিয়েছেন। মন্দির, চাতাল সে কী রক্তে ভাসাভাসি! এত রক্ত এল কোত্থেকে? পরে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল যে সেই চণ্ডাল-পূজোরী শুধু নয়, কালীমায়ীর পূজোয় ওকে যেসব ডোম-চণ্ডালেরা সাহায্য করত, তাদের সকলের লাশ চাতালের আশেপাশে ঝোপঝাড়ে পড়ে আছে। তারপর লোকমুখে স্বপ্নের কথা রটে গেল। কালীমায়ী স্বপ্ন দিয়েছেন, এবার তিনি সব ডোম-চণ্ডালকুলের নিধন করবেন। স্বপ্নের কথা সত্যি হল। এল মড়ক। আকাশে রাতাঁসে লোকে ক্ষ্যাপা কালীমায়ীর রুদ্ররূপ দেখল, খিল খিল হাসি আর খাঁড়ার ঝনঝন শব্দ শুনতে পেল। মড়কে ডোম-চণ্ডালদের বংশ কিছুটা ধ্বংস হল।

তারপর এল বান। গঙ্গামায়ী ক্ষেপে গেল। তীরবেগে ছুটে-আসা

বানের জলের ওপর লোকে এলোকেশীর করালী মূর্তি দেখতে পেয়ে চমকে উঠল। রাতারাতি বানে ভেসে গেল ডোমপাড়ার ছেলে-বুড়ো, কিছু ঘুমন্ত মেয়ে-মদ্দ।

তারপর এল আকাল। এবার সূরয ক্ষেপে গেল। সেই আকালে পুড়ে মরল বহু মানুষ। কিছু লোকে কালীমায়ী, সূরয আর গঙ্গামায়ীর চণ্ডরূপ দেখে এবারও আঁতকে উঠল। কিন্তু মানুষ নিশ্চিন্ত হয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালো যে কোথাও কিছু গুনাহ হয়েছে।

সেই সময় বামুনেরা সব দেশে ফিরে এসে নাকি ফরমান দিয়েছিল অব্রাহ্মণের পাপাচারে পৃথিবী পরিপূর্ণ হয়েছে, চণ্ডালের হাতের পূজোয় মা ক্ষিপ্ত হয়েছেন। তাই এই সব ঘটনা। ফলে এর গুনাগার ডোম-চণ্ডালদের গুণতে হবে। প্রত্যেক ঘব থেকে হররোজ হুটো করে চাঁদির টাকা গুণে দিতে হবে। লোকে কাজকাম করে সংসার চালিয়ে প্রথম দিকে টাকা দিতে লাগল। তাবপর সংসাবে টান পড়লে লোকে ঘটিবাটি বিক্রি কবে টাকা গুণে দিল। অবশেষে কিছু লোক সর্বস্বান্ত হয়ে দেশ দেশান্তবে পালিয়ে গেল। সেই সময় বামুনেরা এসে শ্মশান-কালীব পুজোর দায়িত্ব নিয়েছিল। এবং শোনা যায় এক একজন পুরুত বামুন মোটা টাকার সম্পত্তি করে নিয়েছিল।

এসব গল্প শোনার পর থেকে পদমের মনের খটকা আজও যায়নি। পদমের মনে হয়েছে এসব স্বপ্ন-টপ্ন গল্প-শোলোক সবই বানানো। এর পিছনে বিভিন্ন কালের ছোঁয়া এসে লেগেছে আর তারই সুযোগ নিয়ে ভেতর থেকে বামুনেরা দু'পয়সা লুটে নিয়েছে। পদম লেখাপড়া শেখেনি বটে, ভাষায় সব কথা প্রকাশও করতে পারে না, কিন্তু সেতো বেকুব নয়। ওর রক্তস্রোতে, অনুভবের জগতে এসব ভাসাভাসা কথা ইতস্তত ঘুরপাক খায়।

শ্মশান এলাকার চারপাশে বনজঙ্গল। এই বনজঙ্গল পেরিয়ে কিছুটা দূর দিয়ে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর পাকা সড়ক চলে গেছে। উত্তরে সতীচর, দক্ষিণে নিশাপুর গ্রাম। দূরবর্তী শহর থেকে এই জঙ্গলে শ্মশানে পুজোপাঠ করতে আসার জন্যে বামুন-পুরুতেরা আর বেশীদিন

উৎসাহ পায়নি। উৎসাহের মূল কারণ ছিল গুণাগার আদায়। কিন্তু যারা গুণাগার দেবে সেই ডোম-চণ্ডালেরা তো প্রায় সবই নিকেশ হয়ে গেছে। ফলে কালের গতি বদলে যাবার দরুন বামুনদের আনাগোনা প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। যদিও শহরের পুণ্যবান মহাজনেরা বামুনদের উৎসাহ দেবার জন্যে পাথরের স্থায়ী কালীমূর্তি বানিয়ে দিলেন, শ্মশান ঘাট বাঁধিয়ে দিলেন। কিন্তু তাতেও কাজ হল না। মাঝেমধ্যে ভবঘুরে সাধুবাবার দল একের পর এক আসতে লাগলেন। শ্মশানকালীর রক্ষণাবেক্ষণ, পুজোর ভার তাঁরাই মাথা পেতে নিলেন। তাঁদেরও বসবাসের একটা হিল্লে হয়ে গেল। এই সব সাধুবাবাদের মদত জোগাতে লাগলেন শহরের মহাজনেরা। শহরের বামুন-পুরুতেরা তাই পরবর্তী-কালে জঙ্গুলে শ্মশানের চণ্ডালকালীর পুজোকে খাটো নজরে দেখতে লাগল। তার ফলে এই অঞ্চল, শ্মশানকালী সবই ভবঘুরে সাধু তান্ত্রিকদের জায়গীরে পরিণত হল।

এমনি করে চলল কিছুকাল। কিন্তু চিরকাল তো একইরকম যায় না। এক সাধুবাবা দেহ রাখলে কিংবা কেউ অন্তর্ধান হলে পরের জন এসে জুটতে সময় লাগে। পদম ছেলেবেলায় এক সাধুবাবাকে দেখেছিল। তারপর কী হল কে জানে। তিনি অন্তর্ধান হলেন বুঝিবা! তারপর বহুকাল কোন সাধুবাবা আসেননি। পদম তো এতকাল মায়ের মন্দিরে যা দু'চার পয়সা প্রণামী পড়ত তা দিয়ে মায়ের পুজোর ব্যবস্থা করত, সারা বছর প্রণামীর পয়সা আলাদা জমা রাখত। কিন্তু পুরুত মেলা ভার। কত কষ্ট করে বছরে একবার কালীপুজোর দিন পুরুত যোগাড় যদি বা হত, কিন্তু সারা বছর আর জুটত না। ফলে প্রণামীর টাকা পদমের কাছেই জমা থাকত। পদম সেই টাকা থেকে খুশীমত নিজে খরচও করত। এমনিভাবেই মা কিছুকাল বেওয়ারিশ পড়েছিলেন। লোকে তো পদমকে বলত ওর এন্তেকাল ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু এতকাল তো এই ভাবেই চলে গেল। ওর এন্তেকাল তো কৈ ঘনায় নি!

এই তো বছর দু'য়েক হল নতুন এক সাধুবাবা এসেছেন। শোনা

যাচ্ছে নন্দকিশোব সরকারই নাকি আমদানি করেছেন। তা ভালই করেছেন। বেওয়ারিশ মায়ের একটা হিল্লে হয়েছে। যদিও পদমের হাতে আর প্রণামীর পয়সা আসে না, সবই সাধুবাবার গাঁজা আর রাবড়ির জন্যে খরচ হয়ে যায়। মায়ের পুজো হয় চাঁদা তুলে। তা হোক। তবুও পদম এখন কিছুটা নিশ্চিন্ত। পদমেরা কাছে থাকতে মা পুজো পাবে না এটা দেখা যায় না। এসব ব্যাপারে মোড়ল পদম দোস্ত শুখরামেব সাহায্য পেয়েছে। দু'জনে সব কাজই একজোটে কবেছে। পদমকে লোকে বারণ করা সত্বেও সে এতকাল মায়ের পুজোর সব ব্যবস্থা করে এসেছে। পদম মন্ত্র পড়তে জানলে সে বামুন-পুরুতদের পায়ে ধরে পুজোর জন্যে নিয়ে আসত না।

যাই হোক, এখন তো মায়ের জন্য চিন্তা নাই। এখন দিনরাত শ্মশানচত্বরে সাধুবাবার ধনি জ্বলছে। তার ধোঁয়ায় আর সাধুবাবার কেরামতিতে এখন চারপাশ আচ্ছন্ন। শনি-মঙ্গলবারে তো দলে দলে ভক্তবা আসে, ভিড় জমে যায় শ্মশানচত্বরে। যত দিন যাচ্ছে, মানুষের ততই ধর্মে মতি আসছে। ধর্মে যত মতি আসছে, মানুষ ততই যেন কেমন হয়ে উঠছে। পদমের এত হুল্লোড় ভাল লাগে না। তবে হ্যাঁ, সাধুবাবার বাহাদুরী আছে বটে! শুধু কথার ভেলকিতে লোক জমিয়ে তো বাজীমাৎ করছেন! এই সাধুবাবার জন্যেও পদমকে কিছুটা লোকসান খেতে হয়েছে। প্রণামীর সব কড়ি এখন সাধুবাবা গাঁটে বাঁধছেন। কৈ এখন তো কেউ বলছে না সাধুবাবার এন্তেকাল ঘনিয়ে এসেছে? শুধু পদমের বেলায় যত গণ্ডগোল। পদম অতশত ধর্মকর্ম বোঝে না। সে বোঝে আসল হল মানুষের জীবন। দোস্ত শুখরামই ওকে আসল কথা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছে। জাত-ধর্মের ওপর একটা টান যদিও আছে পদমের, তবুও দোস্তের কথাই হল সার কথা, খাঁটি কথা। জীবনে আরামসে বেঁচেবর্তে থাকাই হল ধর্ম। সেটাই পদমের হচ্ছে না আজকাল। তাহলে কিসের ধর্ম। এখম পদমের কোন কাজকাম নাই। আরাম তো দূরের কথা, ওর বেঁচে থাকাই বড় মুস্কিল হয়ে পড়েছে এখন।

পদমের সবচেয়ে বড় লোকসান হয়েছে অন্যদিকে। সাধুবাবা আর নন্দকিশোর সরকার দু'জনে জোট বেঁধে পদমকে শ্মশান এলাকা থেকে প্রায় সরিয়ে দিয়েছেন। শ্মশান এলাকাই ছিল ওর রুজি-রোজগারের আসল জায়গা। সাধুবাবা আসার দরুন অঢেল প্রণামী পড়ছে, ঘটা করে মায়ের ভোগ হচ্ছে, কিছু পয়সাকড়ি এদিক-ওদিক হলেও ধুম-ধামের অন্ত নাই। পদমের তার জন্য কোন আফসোস নাই। সাধুবাবা যে জাতই হোক, উনি সাধুবাবা। এতেই মানুষ খুশী। দু'বেলা মায়ের ভোগ তো হচ্ছে। এতে পদমেরও আনন্দ। কিন্তু পদমের দুঃখ হল বাপ-পিতেমোর আমল থেকে ওদের শ্মশানে বাস, শ্মশানেই যত কাজ-কারবার, মানুষের এন্তেকালে পাশে থাকাই ওদের ধর্ম। সেই শ্মশানের চোহদ্দির বাইরে পদমকে হটিয়ে দিয়েও ওরা ক্ষান্ত হয় নি, তার ওপরে জুলুমবাজি। অথচ এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার ক্ষমতাও পদমের নাই। দোস্ত শুখরামের মদত পেলে যা হোক কিছু ঘটত। কিন্তু তার শ্মশানের কাজকামের ব্যাপারে যেন কোন গরজ নাই। ফলে পদম এখন অসহায়।

* * *

গোলমাল চলেছে বেশ কিছুকাল যাবৎ। যেদিন থেকে নন্দকিশোর সরকার শ্মশানের দিকে হাত বাড়িয়েছেন, তখন থেকেই পদমের দুর্গতি শুরু হয়েছে।

আগে শ্মশান চত্বরের একপাশে শবদাহের জন্য কাঠ মজুত থাকত। বাপ-পিতেমোর আমল থেকেই ওদের এই কারবার। মড়ক ও আকালে ওদের জাত প্রায় সাবাড় হয়ে গেলেও পদম আর দোস্ত শুখরাম পালাক্রমে এই কাজ করত। রূপচাঁদ যখন নোকরি পেল, শুখরাম তখন থেকে এই ধকলের কাম ছেড়ে দিল। আগে তো বনজঙ্গল থেকেই সহজে কাঠ জোগাড় করা যেত। ওরা কাঠ কুড়িয়ে আনত। কিন্তু দিনকে দিন সব কাঠ মহাজনদের খপ্পরে চলে যাবার ফলে কাঠ জোগাড় করা বড় মুস্কিল হয়ে উঠল। পালা অনুযায়ী কাঠ জোগাড় করতে গিয়ে পদমই একদিন ধরা পড়ল। ওকে কোমরে দড়ি বেঁধে

এনে হাজির করা হল কাঠের মহাজন বড় গোলদার নন্দকিশোর সরকারের সামনে। বেঁধে আনার সময় সরকারের লোকজনেরা বেশ ঘা কতক পদমকে দিয়েছিল। সেদিনও এই হুলো আর ঢ্যাং ওকে বেঁধে এনেছিল।

মহাজন সরকার সব কথা শুনে বললেন, হ্যাঁরে ব্যাটা, চুরি করেছিস ক্যানে? তোকে থানায় দিলে তো হাজতে গিয়ে পচে মরবি।

পদম বলল, হামি তো চোরি করি নি হুজুর। হামরা তো বরাবর ইভাবে কাঠ লিয়ে আসছি, কেহু তো হামাদের এতকাল চোট্টা বলেনি।

—কিন্তু এখন বলবে। এখন থেকে জেনে রাখিস এসব কাঠ আমার।

—হুজুর, হামার কসুর হয়ে থাকলে মাফ করবেন। লেকিন হামরা কি তাহলে আর লকড়ী পাবনা? তাহলে মড়া পোড়ানো হবে কিভাবে?

মহাজন হেসে বললেন, সে ব্যবস্থা হবে। কিন্তু জেনে রাখ, জমিদারের কাছ থেকে এসব জঙ্গলের কাঠ আমি মোটা টাকায় কিনে রেখেছি। তার থেকে একটা কাঠও চুরি গেলে তোদের সকলকে আমি হাজতে পাঠাব। আর শ্মশানের কাঠ যোগান দিবার ঠিকাদারী একমাত্র আমার। তুই আমার পক্ষে কাজ করবি।

পদম বলল, তাহলে লকড়ী কি ভাবে মিলবে হুজুর? একটা বেবোস্তা তো হবে?

—হবে। আগে সব কাঠ আমার গোলায় উঠবে, তারপর তুই আমার কাছ থেকে দরকার মতো কাঠ কিনে নিয়ে যাবি, সেই কাঠ ঝেড়ে মোটা টাকা করবি। ব্যাস্, মিটে গেল ঝামেলা, বুঝেছিস্?

এটা বছর দুয়েক আগেকার কথা। দোস্ত শুখরাম শুনে পিছু হটে গেল। সে বলল, হামরা গরিব আদমি পদম ভাইয়া। বাবু-সাহাবদের সাথে উসব লেনাদেনার কারবারে গেলেই ঠকতে হবে। আজ জঙ্গলের লকড়ী গেল, কাল জান ভি যাবে। উসব কারবারে হামি নাই। লকড়ী ছোড় দো, দুসরা কাম দেখো ভাইয়া।

দোস্ত শুখরাম তো বলেই খালাস। ওর বেটা রূপচাঁদ নোকরি পেয়েছে। সে সুখের মতো কথা বলতে পারে। কিন্তু পদমের কী হবে? পদমের যে লেড়কী টগর। সে যদিও ঘরে বসে কুলো ঝুড়ি বানায়, কিন্তু খরিদ্দার নাই। আজকাল আবার অনেকেই এইসব কাম করছে। ফলে বাধ্য হয়েই পদম মহাজনের কথায় রাজী হয়ে গেল।

প্রথম দু'এক দফা বেশ ভালই চলল। আগে তো বনজঙ্গল থেকে কুড়িয়ে পদমেরা বেশী কাঠের যোগান দিতে পারত না। যারা মড়া পোড়াতে আসত, তাদেরকে বাজার থেকে কাঠ কিনতেই হত। এখন মহাজন কাঠের যোগান দেন বলেই সবসময় অফুরন্ত কাঠ মজুত রাখা যায়। মড়া পোড়াতে এসে লোকজনকে আর ধকল করে বাড়তি কাঠেব জন্যে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে হয় না। সরকারমশাই বেইমান নন, তিনি আগাম কাঠেব দাম নেন না। যেমন বিক্রি তেমনি দাম। সবকারের লোকজনেরা সব হিসাব রাখে।

হঠাৎ একদিন নন্দকিশোর সরকার পদমকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, হ্যাঁরে পদম, কী কম্ম জুড়েছিস? তুই আমার গোলা থেকে যত কাঠ লিয়েছিস, আর যা টাকা শুধেছিস, তাতে হিসাব করে দেখা যেছে আখুনো তোর কাছে আমার বহুত টাকা পাওনা আছে। পিছ্‌লা টাকা শোধ না দিলে তো তুই আর কাঠ পাবি না। কাঠ তো মাঙ্গনা আসে না! পাই-পয়সা হিসাব আমার খাতায় টুকা আছে। বকেয়া টাকা শোধ দিয়ে যা, তবে কাঠ পাবি।

পদম বলল, ক্যানে হুজুর, হামি তো সব পাওনা শোধ দিয়ে যাই। হামার মজুরী ছাড়া তো হাতে কুছু রাখি না। আর যা থাকে, তাতে তো হামার খানা-পিনা জোটানো বড় তকলিফ হয়। হামি সচ্‌ বাত বলছি হুজুর। ইসব কিসের পাওনা হামি জানি না।

—আরে আমি কি বলছি, আমার খাতা বলছে পাওনা আছে। তা তোর কাছে টাকা পাওনা আছে, আর তুই জানবি না, ইতো হয় না। ই কেমন কথা! তাই বলছি কি, তুই কাঠের কারবারটা আমার হাতেই ছেড়ে দে। আমার লোকজন উখানে বসেই কাঠ বেচবে।

মড়া এলে তুই শুধু হাজিরা দিবি। ঘাট খরচা যা পাবি তা থেকে কিছু কিছু করে দিয়ে আমার পিছলা টাকাটা শোধ করে দিস। তুই তো গবিব মানুষ। টাকা ভেঙে খেয়ে ফেলেছিস, তা আখুন কী করা যাবে! তুই বলেই এটুকু করলাম। একসঙ্গে টাকা নিব না, ধীরে ধীর শোধ করে দিস।

পদম ক্ষুব্ধ মনে ফিরে আসে। দোস্ত শুখরাম ভাইয়া ঠিক বাত বলেছিল। মহাজন বাবুদের সঙ্গে উসব কারবারে জড়াতে গেলেই শেষে জান খতম হয়ে যাবে। কিন্তু এখন কী উপায়! টাকা শোধ না-দিতে পারলে তো নন্দকিশোর সরকার ওকে হাজতে পাঠাবেন। পদম মহাজনকে এতদিনে বুঝে ফেলেছে। লোকটা মোটেই সিধে রাস্তার আদমি নয়। দোস্ত শুখরাম যত সহজে এসব ঝুটঝামেলার কারবার থেকে সরে দাঁড়াতে পেরেছে, পদম তা পারেনি। ওকে কি এখন তাহলে সারাজীবন ধরে এই মিথ্যা ঋণ শোধ করতে হবে? পদম কোন পথ খুঁজে পায়নি। সে দোস্ত শুখরামের সঙ্গেও আলাপ করেছে। কিন্তু কোন পথ বেবোয় নি। অগত্যা পদম ভেবেছে, নসীবে যা আছে তা হবেই, কেউ রুখতে পারবে না।

শ্মশান চত্বরে যে-ছাউনির তলায় এতকাল পদমের কাঠ মজুত থাকত, এবাব তা সরাসরি সরকারের হাতে চলে গেল। পুরানো ছাউনি ভেঙে নতুন কাঠগোলা তৈরী হল। কাঠ মজুত রাখার জন্য ভেতরে গুদাম ঘর বানানো হল। বাইরে গদি, মহাজনের মোকাম বসল। সবই বেশ মজবুত করে বানানো হল। মাঝে মাঝে নন্দ-কিশোরও সেখানে এসে বসতে লাগলেন। অষ্টপ্রহর মহাজনের লোক-জন পাহারায় থাকল। এখন থেকে শ্মশানযাত্রীদের যাবতীয় খরচ চারগুণ বেড়ে গেল। সারাদিনে তো বেশ কিছু মৃতদেহ সংকারের জন্যে আসছেই। মহাজনের লাভ আগের তুলনায় অনেক বাড়ল। কিন্তু পদমের কপালে কিছুই জুটল না। পদমের এখন আর কোন কাঁজ নাই। শ্মশানে মড়া এলে কাঠ জোগান দেবার কাজ মহাজনের লোকজনেরাই করে। পদমকে ঠুঁটো জগন্নাথের মতো দাঁড়িয়ে থেকে

একবার হাজিরা দিতে হয়। মহাজনের লোকজনেরাই হিসাব করে পার্টির কাছ থেকে টাকা আদায় করে। তাতে ডোমের পাওনা বাবদ একটা মোটা টাকা ধরা হয়। কিন্তু পদমের নসীবে যৎসামান্য বকশিস ছাড়া আর কিছুই মিলে না। ফলে পদমের তকলিফ আরও বেড়ে গেল। পদম আর বেটি টগরকে প্রায়দিনই শুখাভুখা কাটাতে হল। বেটি টগরের জন্যে পদমের মনে বড় দুখ জমতে লাগল। আর মহাজন নন্দকিশোর সরকারের ওপর দিন দিন পদমের গুস্‌সা বাড়তে লাগল। এক একদিন পদমের মনে হতে লাগল, ওই বেতমীজ কাঠের বেপারী নন্দকিশোরের ধড়মুণ্ডু কুড়ালি দিয়ে কাঠের মত কুপিয়ে কাটতে পারলে তবেই শান্তি। কিন্তু ওর পোষা কুত্তাগুলো বড় নচ্ছার। ওরা কথায় কথায় আদমি জবাই করতে পারে। পদমকেও খতম করে দিতে পারে। তাই পদমের মনের গুস্‌সা মনে চেপে রাখাই ভাল তা না হলে টগর মায়ী বড় লাচারে পড়ে যাবে।

মাস কয়েক পর আবার একদিন মহাজন নন্দকিশোর সরকার পদমকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তোকে লিয়ে তো বড় হুজ্জত হছে দেখছি। এখনও তো তোর সব টাকা শোধ হল না, ইদিকে ডোমের পাওনা, ঘাট খরচা যা নিত্যি-নৈমিত্তিক উঠে, তা তো সব তুই কড়ায় গণ্ডায় বুঝে হাত মুচড়ে লিয়ে যাস। বিনা খাটনিতে, বিনা পুঁজিতে শুধু জাতে ডোম বলে তোর টাকা উপায় হছে, আর ইদিকে আমার লোকজনের হিস্‌সা কমে যেছে, তোর বকেয়া দেনাও শোধ করতে পারছিস না—এভাবে লোকসান দিয়ে তো কারবার চলে না। কথাটা ভেবে দেখিস পদম। আমার লোকজন খাটবে আর তুই ওদের হিস্‌সার টাকা কেড়ে লিয়ে চলে যাবি, ইতো হয় না। ইসব তোর কুন্ ধম্মের কথা, তুই বিচার করে বল্।

পদম খর নজরে নন্দকিশোরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, ঝুটা বাত, হামি কুছু কেড়েকুড়ে লিই না, হামাকে হাতে তুলে যা দেয়, তাই লিয়ে যাই। লেকিন তাতে তো হামার দিন যায় না হুজুর, শুখাভুখা থাকতে হয়।

নন্দকিশোর একবার টেরা চোখে পদমের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার লোকজন মিথ্যা কথা বলে না পদম। তুই এখন থেকে ঘাটে মড়া এলে শুধু হাজিরা দিবি, যতদিন তোর টাকা শোধ না-হয় ততদিন আর এক পয়সাও পাবি না।

—যে কামে পয়সা নাই, হামি আর সে কাম করব না হুজুর, আপ্‌লোগ দুসরা আদমি ঢুঁড়ে লেবেন। হামি আর মাঙ্গনা কাম করব না।

নন্দকিশোর এবার চড়া গলায় বলেন, তোর দেনা বুঝি দুসরা আদমি শোধ করবে? দেনা শোধ হলে তুই কাজ ছেড়ে দিস, আমি ঠিক দুসরা লোক লিয়ে আসব। কিন্তু তার আগে মাঙ্গনা কাজ করেই তোকে দেনা শোধ করতে হবে।

—ইয়ে আপ্‌কো কেয়া বিচার হ্যায় হুজুর? হামি জানে মরে যাবো।

—তোর ভালর জন্যেই বলছি। তুই গরিব মানুষ, একবারে টাকা দিতে পারবি না বলেই বলছি। টাকা শোধ হয়ে গেলে তখন তো তুই মুঠা মুঠা টাকা পাবি।

—নহী, শুখা কাম ম্যাঁয় কভি নহী করুঙ্গা।

—তাহলে তুই আমার টাকা সব একবারে শোধ করে দে। তারপর কাজ ছেড়ে তুই যেখানে খুশী চলে যা, আমার বলার কিছু থাকবে না।

—হামার গোস্তাকি মাফ করবেন হুজুর। অনেক সহ্য করার পর পদম এবার শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়িয়ে বলল, ইসব ঝুটা দেনার দায় হামার ঘাড়ে চাপালে হামি কিছুতেই মেনে লিব না, হামি এক পয়সাও দিতে পারব না। আপ্‌কো যো মতলব হ্যায় আপ্ কর্ লিজিয়ে—

পদম আর এক মুহূর্ত নন্দকিশোরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে না। সে হনহন করে হেঁটে চলে যায়।

পিছন থেকে নন্দকিশোর গর্জন করে ওঠেন, এই হারামজাদা,

কী বললি ? ঝুটা দেনা ? তোর জিভা টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিবোরে শালার ব্যাটা শালা ! টাকা শোধ না-করলে তোকে জিয়ন্ত পুঁতে ফেলব। কোথায় পালাবিরে ব্যাটা ? চারদিকে আমার জাল বিছানো আছে। যেছিস যা, কিন্তু তোকে আমি খ্যাপলা জালে একদিন টেনে তুলব, জেনে রাখিস।

কথাটা পদমের কানে এলেও পিছন ফিরে সে আর কোন জবাব দেয়নি। শিরদাঁড়া খাড়া রেখেই সে ফিবে এসেছে। সে অনেক অত্যাচার সহ্য করেছে। দিনে দিনে তার সবই কেড়ে নিয়েছেন নন্দকিশোর। বাপ-পিতেমোর আমল থেকে যে-অধিকার ছিল, তাও হারিয়েছে সে। এখন শুধু দিনমজুরী, তাও মহাজন দিতে নারাজ। মগের মুলুকেও এমন জবরদস্তি ছিল কিনা সন্দেহ। এবার একটু রুখে না-দাঁড়ালে নন্দকিশোর পদমের লহু চুষে খাবেন।

তারপর থেকেই পদমের ভাবনা বেড়ে যায়। সে দিনরাত সকাল-সন্ধ্যে বসে বসে ভাবে শুধু। কাজকাম নাই, পয়সাকড়ি নাই। হায়রে কিসমৎ! কী করবে সে দিনরাত ভেবে কূল-কিনারা পায় না। বেটি টগরের বিয়ে দিতে পারলে এই দেশ-গাঁও ছেড়ে অন্য কোথাও সে দিনমজুরী করতে চলে যেত। টগর সোমত্ত মেয়ে। খুবসুরতও বটে! সে ঘরে বসে কুলো ধামা বেতের ঝুড়ি বানিয়ে হাটে বেচতে যায়। দেশের ছেলে-ছোকরার দল ওর পিছু নেয়। দেশের মুরুব্বিরা অভিযোগ করে। কেউ কেউ শাসিয়ে যায়। এই তো দু'দিন আগে একদল মুরুব্বি এসে অকারণে হামলা করে গেল। পরে খবর নিয়ে পদম জেনেছে, নন্দকিশোরই মুরুব্বিদের ভজিয়ে পাঠিয়েছিলেন। ভাগ্যিস টগর তখন ঘরে ছিল না। সে কী কেলেঙ্কারি ব্যাপার!

একজন মুরুব্বি তেড়েফুঁড়ে এসে বলল, কীরে পদম, আমাদের ছেলেপিলেদের নষ্ট করে জাহান্নামে দিবার জন্যে মেয়েকে লেলিয়ে দিয়ে তো বেশ দিব্যি ঘরে বসে মোচে তা দিচ্ছিস, এঁ্যা! বিহা দিতে না-পারিস তো মেয়েকে বেশ্যালয়ে পাঠিয়ে দে। কিন্তু তাই বলে দেশ জুড়ে এই অনাচার আমরা কিছুতেই সহ্য করব না।

দ্বিতীয় জন তো প্রায় হাত গুটিয়ে এগিয়ে এল, বলল, ফের যদি তোর মেয়েকে ঘরের বাহিরে যেতে দেখি তো ভিটে মাটি উচ্ছন্ন করে তোকে দেশছাড়া করব।

তৃতীয় জন বলল, আরে ভায়া, উ মেয়ে আমাদের ছেলে-পিলেদের গায়ে যে নতুন রস ঢেলে দিয়ে এসেছে! ছেলেপিলেতো বুঝেনা যে উয়া খাঁটি রস লয়, বিষ! তাতে তো ঘরের বাহিরে না গেলেও আখুন ওই ছুঁড়ির টানে টানে ছোঁড়াগুলো যে ইখানে এসে ঘরের চারপাশে ঘুর ঘুর করবে।

দ্বিতীয় জন বলল, ই কথা তো ঠিক বটে হে! তবে উপায়?

তৃতীয় জন বলল, আর দেশ ছাড়া করলে তো ভিন্ দেশে গিয়েও নষ্টামো করবে। ইখানকার ছেলেপিলেরাও গন্ধে গন্ধে সেখানে যেতে কতক্ষণ? ঘোর কলিকাল হে! সব কথা মাথায় রেখে তবে কাজ করবা।

প্রথম জন বলল, ঠিক ঠিক। আরে ভায়া, সেই খেতুরের মেলায় সেদিন যেয়ে দেখি কি ছুঁড়ির কী রং ঢং! হেসে হেসে নেচে কুঁদে ঝুড়ি-কুলো বেচছে। ছোঁড়াগুলো সব গোল হয়ে ঘিরে ধরেছে। ছুড়ি তো দেখি বুকের কাপড় প্রায় উদাম করে ছোঁড়াগুলোর গায়ে ঢলে ঢলে পড়ছে। ছিঃ ছিঃ! কী বেলেল্লা বেহদ্দের কারবার হে! দেখে গা-পিত্তি জ্বলে যেছিল। কিন্তু মুখেতো রা কাড়া যাবেনা। ক্যানে না, ইসব ছেলেপিলেতো খুব সুবিধার জন্তু না! মান-খাতির দূরে থাক, ঘা কতক কষে দিতে কতক্ষণ! তাই বাক বন্ধ করে সব দেখে যেতে হল। কিন্তুক দেশটা যে অনাচারে ভরে উঠছে সে কথাটা আর বলে কে!

দ্বিতীয় জন বলল, সেই তো কথা। তুমি দেশের কুন্ ছোঁড়াকে ধরে কী-বা বলতে যাবা? বলতে গেলে কি রেহাই আছে? তুমি তো ঘা কতকের ভয় করছো হে। আরে ভায়া, উসব লিয়ে লাড়া-ঘাঁটা করতে যেয়োনা, সাবাড় হয়ে যাবা। চিনোনা তো ছেলে-পিলেদের!

তৃতীয় জন বলল, হ্যাঁ গো, আমি শুনেছি ছুঁড়ির নাকি আসল নাগর হল গিয়ে তুমার ডোম শুখরামচাঁদের ব্যাটা! সেদিন যদি সে ছোঁড়া ইসব ঢলাঢলি আর ছোঁড়াগুলোর লকলকে নোলা দেখত, তাহলে তো দুপক্ষে একটা খুনোখুনি রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যেত। শহরে ভূমিকম্প হত হে! ইদানীং সে ছোঁড়াও তো কম যায়না শুনেছি।

দ্বিতীয় জন বলল, তাহলে সবাই মিলে একটা বিধান দাও।

তৃতীয় জন বলল, বিধান আর কী! তারপর পদমের দিকে তাকিয়ে বলল, এই যে শোন পদম, তোকে কটা দিন সুময় দিয়ে যেছি। ইয়ার মধ্যে যদি তোর হুঁশ-আক্কেল না-হয়, যদি মেয়েকে বেঁধে শাসন করতে না-পারিস, আর জলদি বিহার বেবোস্তা না-করতে পারিস, তো তোকে এই মাটিতে জিয়ন্ত পুঁতে রেখে যাব। বুঝেছিস?

হ্যাঁ। পদম সবই বুঝেছে। কিন্তু এসব ফালতু কথায় সে কোন জবাব দেয়নি। সে চুপ করে সব কথা হজম করেছে। এ ছাড়া উপায় কী? অকারণে কথা বাড়িয়ে লাভ নাই। পদম সব কথাই জানে। টগর ওকে সব কথাই জানায়। টগর হাসি-খুশী সোমত্ত খুবসুরত মেয়ে। সে যেখানেই যাক না কেন, অপদেবতার ভিড় জমবেই। আর সেই কারণে টগরের কাছে লোকে মালও কিনে। এই মুরুব্বিরাও কিনে। অথচ দিনের পর দিন পদম নিজে কত ভাল ভাল মাল বাজারে বেচতে গিয়ে ফিরে এসেছে। খরিদ্দার হয়নি। আর টগর সেই একই মাল পরে একদিনেই সব বেচে আসতে পেরেছে। পদম বুঝে না কিছু? সে মনে মনে ভেবেছে: শালোরা সব এখন মুরুব্বি সেজে শাসাতে এসেছো? যাও, ঘরে গিয়ে তুমলোগ নিজেদের চরিত্তির খুলে দেখোগা। সব বুঝবা, জানবা। হামাকে কুছু বুঝাতে এসোনা হে মুরুব্বির দল! সব ভাল আদমি সাজতে এসেছো! টগরকে লিয়ে তুমলোগ কী রং তামাশা করো তা হামার সব কুছ জানা আছে। গরিব আদমির লেড়কী, পেটের দায়ে বাজারে মাল বেচতে যায় বলে তুমলোগ তাকে নষ্ট করতে চাইবা, আবার পাল্টা হামাকে দোষ দিয়ে শাসিয়ে যাবা? পদম এ সব কথা ভেবেছে, কিন্তু

স্পষ্ট জবাব দিতে পারেনি। কারণ গরিব আদমির চোপা নাড়াও নাকি দোষ!

মুরুব্বির দল চলে গেলে পদম অন্য কথা ভেবেছে। বেচারী টগর পেটের জ্বালায় বাপের দুখ দেখে বাজারে মাল বেচতে গিয়ে বহুত তকলিফ সহ্য করছে, আর পদম বুড্ঢা মর্দানা, কাজকাম নাই, পয়সা-কড়ির ধান্দা নাই, খালি ঘরে বসে বসে লেড়কীর পয়সায় গিলবে, এ বড় শরম কি বাত, বড় আফসোসের কথা!

চারপাশ থেকে পদমের দুর্ভাবনা দিন দিন আরও বাড়তে থাকে। টুটাফাটা নসীব নিয়ে এভাবে আর কতদিন বেঁচে থাকা যায়! টগরের মা মরে বেঁচেছে। টগরের একটা হিল্লে করতে পারলে ওর শান্তি। ওর দুখ আর সহ্য হয়না। আর সহ্য হয় না পাঁচজনের শাসানি। একদিকে নন্দকিশোর, অন্যদিকে মুরুব্বির দল সবাই ওকে জিয়ন্ত কবর দিয়ে পুঁতে ফেলবে বলে শাসিয়ে যাচ্ছে। নন্দকিশোর তো ওকে খ্যাপলা জালে তুলবেন বলেও শাসিয়ে রেখেছেন। অথচ সে জানেনা তার অপরাধ কোথায়!

নন্দকিশোর পদমের কাছে বকেয়া দেনা শোধের দাবি করছেন। তিনি পদমকে এখন থেকে মাগনা খাটিয়ে নেবারও মতলব করছেন। তিনি জানেন পদম কারও ধাঁর ধারে না। কিন্তু দেনার দাবি, হুমকি আর আধা মজুরি দিয়ে গরিব আদমিকে খাটিয়ে নেওয়া যায়, তা নন্দকিশোর ভালই বোঝেন। কিন্তু মাগনা খাটানো যায় কী? যায়না, সেকথা পদম নন্দকিশোরকে সরাসরি জানিয়ে এসেছে। দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়! টুটাফাটা নসীব নিয়ে একজন গরিব আদমি কতক্ষণ জুলুম বাজি সহ্য করে বেঁচে থাকতে পারে? কিন্তু তবুও সে আর শুখা কাম করবে না। নন্দকিশোরের যা খুশী তা করে নিতে পারেন।

পদম নন্দকিশোরের মুখের ওপর এই জবাব দিয়ে আসার পর থেকে সে আর শ্মশানের দিকে যায়নি। এদিকে শ্মশানে মড়া আসছে প্রতিদিন। কাঠের যোগান দিয়ে যাচ্ছেন নন্দকিশোর।

লোকজন বহাল রেখেছেন তিনি অন্যান্য কাজকর্মের জন্য। কিন্তু ডোম? ডোম না-হলে তো চলবে না। জীবের মুক্তি হবে না। চারপাশে পদমকে খোঁজ করার জন্য লোক ছুটেছে। পাওয়া যায়নি। শুখরামকেও নয়। কোন ডোম-চণ্ডালকে একগোছা টাকা দিয়েও জোগাড় করা সম্ভব হয়নি। অথচ চিতা সাজানো থেকে দাহ করার সময় পর্যন্ত ডোম-চণ্ডালের ছোঁয়া না-পেলে তো জীবের উদ্ধার হয় না। পদমকে খুঁজে না-পেয়ে অগত্যা নন্দকিশোর ওঁর লোকজনের মধ্যে একজনকে ডোম সাজিয়ে দু'একবার কাজ চালিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু আর সাহস হয়নি। কারণ কথাটা রটে গেলে তো তুলকালাম কাণ্ড! মেরে সবাই তক্তা বানিয়ে ছেড়ে দেবে। তাই সেদিন থেকে ফের পদমের খোঁজ চলছে অনবরত।

নন্দকিশোরের ধারণা পদম পালিয়েছে কিংবা কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে। সুতরাং হুলো আর ঢ্যাং চারদিকে তন্নতন্ন করে পদমকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। অবশেষে শুখরামের ঘরের সামনে থেকে ওরা পদমকে প্রায় বেঁধে নিয়ে এসে হাজির করল নন্দকিশোর সরকারের সামনে। নন্দকিশোর তখন শহরের মোকাম থেকে শ্মশানের মোকামে এসে বিশ্রাম নিয়ে হিসেব-নিকেশ করছিলেন।

*   *   *

এখন নন্দকিশোর সরকারের মেজাজ অদ্ভুত রকম শান্ত। নন্দকিশোর হয়ত বুঝেছেন, চোখ রাঙিয়ে পদমকে দিয়ে কাজ করানো যাবেনা। অথচ পদমকে না-পেলে নন্দকিশোরের একদণ্ড চলবেনা, কারবার অচল হয়ে যাবে। কাঠ বিক্রির কারবার ছাড়া শ্মশান এলাকাই ওঁর আসল কারবারের জায়গা। কাঠের কারবার তিনি ছাড়তে পারেন, কারণ এতে আর ক' পয়সা লাভ হয়। কিন্তু শ্মশান এলাকা তিনি কিছুতেই ছাড়তে পারবেননা। শ্মশান এলাকায় গতায়াত রাখতে গেলে বাইরে কাঠের কারবারের একটা ভোল রাখা দরকার। আর সেই ভোল বজায় রাখতে গেলে পদমকে ধরে রাখতে

হবে। নচেৎ কারবার অচল। পদমকে যত সহজে পোষ মানানো যায়, শুখরাম বা অন্য কাউকে দিয়ে তা হবেনা। তাছাড়া শুখরামকে ডাকার সাহস নন্দকিশোরের নাই। কারণ ওর ছেলে রূপচাঁদটা ভয়ানক দুর্ধর্ষ। শুখরামেব ওপর খবরদারি করতে গেলে নন্দকিশোরের খতম হবার ভয় আছে। সুতরাং পদমই নন্দকিশোরের কাছে এক-মাত্র সহজলভ্য ব্যক্তি, যাকে খুশীমত চালানো যায়। তাই আপাতত ওর সঙ্গে চটাচটি করে লাভ নাই। বরং ওকে দিয়ে আরও বড় কাজ বাগিয়ে নেওয়া যায়। নন্দকিশোর তাই খুশীতে ডগমগ হয়ে হাসি মুখে পদমের দিকে তাকান।

—আয়, বস পদম, শরীর বুঝি খারাপ ছিল? আমি বুঝেছি, পদম নিশ্চয় ঠেকায় পড়ে আসতে পারছে না। তা নাহলে পদম তো তেমুন বেইমান মানুষ লয়। পুছে দেখ, আমি সব্বাইকে বলেছি, বেচারা নিশ্চয় ব্যারামে পড়েছে।

পদম অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। হুলো আর ঢ্যাং নন্দকিশোরের ব্যবহার দেখে ততোধিক অবাক হয়ে যায়। ওরা ভেবেছিল পদমকে দু'চার রদ্দা লাগানোর অর্ডার এক্ষুনি পাবে। সেজন্য ওরা প্রস্তুতিও নিচ্ছিল। কারণ এই হারামজাদা কটা দিন খুব জ্বালিয়েছে, সহজে আসতে চায়নি, তার ওপরে রূপচাঁদ মাস্তানকে লেলিয়ে দেবার ধান্দা করেছে। সেইজন্য ওকে দু'চার ঘা দেওয়া দরকার। কিন্তু তার বদলে মালিক সরকারের একী আচরণ! এত তকলিফ করে ঢুঁড়ে নিয়ে আসা তো প্রায় বরবাদ হয়ে গেল। ওরাও হা করে নন্দকিশোর সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকে।

নন্দকিশোর হুলো আর ঢ্যাঙের দিকে তাকিয়ে ফের বলেন, জানিস তোরা, পদম আমার কাঙালের হরি। তা বাপধনেরা, কোথায় ওর দর্শন পেলি?

ঢ্যাং বলল, সহজে এসেছে নাকি! আমরা ওকে প্রায় তুলে এনেছি।

হুলো সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে বলল, তুলে না, ডেকেই এনেছি।

—না না, আসবে, আসবে। ভক্তের টানেই ভগবান আসেরে। জুলুম করে কি ভগবান হরিকে ধরে বেঁধে রাখা যায়? অন্তরের টানেই তিনি ধরা দেন, বুঝেছিস?

হুলো আর ট্যাং কী বুঝল কে জানে! ওরা দু'জনেই এদিক ওদিক সরে গেল। ওদের ওপর আরও অনেক কাজের ফরমায়েশ আছে।

নন্দকিশোর সরকার গেঁজে থেকে দু'খানা দশটাকার নোট পদমের হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, লে বাপ, ভাল করে ওষুধ-পথ্যি কর। পেট ভরে খা, তবে তো শরীরে বল হবে, কাজকামে মন আসবে। খামোকা রাগ করে আত্মাকে কষ্ট দিসনে বাপ। মানুষের দিন তো চিরকাল একরকম যায়না।

পদম টাকা ফিরিয়ে দিয়ে দু'পা পিছনে সরে এসে বলল, এ কিসের রুপিয়া হুজুর? হামি তো কটা দিন কাম করিনি, হামার তো কোন পাওনা নাই।

নন্দকিশোর টাকাগুলো হাতে তুলে নিয়ে ফের পদমকে ফিরিয়ে দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করে বললেন, দেনা-পাওনার কথা আর তুলিস না বাছাধন। দু'দিনের জন্যে আমরা সবাই এ-জগতে এসেছি, উসব হিসাব-নিকাশে কাজ কী? কটা দিন হেসে-খেলে চলে যেতে পারলেই ভাল। লে ধর, অবহেলা করিস না বাপধন। যাচা ভাত আর কাচা কাপড় সেধে দিলে পায়ে ঠেলতে হয়না। তুই তো আমার চেয়ে কম বুঝনেওয়ালা আদমি নস্।

—ই রুপিয়া হামি লিতে পারব না হুজুর, হামার গুনাহ হবে।

নন্দকিশোর এবার হো হো করে হেসে উঠলেন, বললেন, আরে বাপধন, পাপ-পুণ্যি বলে এ-জগতে কিছু নাই। বরং যে করে পাপ, সে হয় সাত ব্যাটার বাপ। তুই তো কেড়ে লিছিস না, এ হল আমার ভালবাসার দান। ঠাকুরের দুয়োরে মানুষ যে প্রণামী দেয় তা লিলে কি ঠাকুরের গুনাহ হয়, না ঠাকুর সে দান ফিরিয়ে দেয়? তবে হ্যাঁ, ঠাকুর মানুষকে দু'হাত ভরে দেয়, ধনে-প্রাণে বাঁচায়। তুইও

আমাকে সেইভাবে বাঁচাবি। এই তো হল সাফসুফ কথা। তুই আমার প্রাণের ঠাকুর বাপধন।

—তোবা তোবা, ইসব কী বাত হুজুর! কানে ঢুকলে হামার গুনাহ হবে। গোস্তাকি মাফ করবেন, হামি গরিব আদমি, শুখাভুখা মরছি, লেকিন ফালতু রুপিয়া হামি লিতে পারব না। কাম করব, রুপিয়া লিব, শুখা খাটব না।

—ঠিক কথা। কাজ তো তুই আগেও করেছিস, পরেও করবি, টাকাও লিবি। তাহলে এই টাকাটা কী দোষ করল বাপধন। লে, কথাটা রাখ, অবহেলা করিস না।

—না হুজুর, হামার তো আর কুছু নাই, সবই চলে গিয়েছে। তো হুজুরের হুকুম মাফিক কাম করতে গিয়ে দেখলাম মজুরি ভি মিলছে না, শুনছি পাল্টা নাকি হুজুরের কাছে হামার দেনা হয়ে গিয়েছে। তো হামার লেড়কী বলছে এইসা কামে কেয়া ফায়দা। তো সোচ্‌তা হ্যায় কি ইসব কাম ছোড়কে বাপ-বেটি মুলুকমে চলে যাব। আর যদি বেটির শাদী দিতে পারি তো হামার ছুট্টি। হামি আর ইসব কাম করবনা বাবু। ই টাকাটা রেখে দেন, হামার দেনা তো কুছু শোধ হয়ে যাবে। শুখা মরতে রাজী, লেকিন দেনা রাখতে রাজী নহী।

—ওরে শোন, উসব মুলুকে যাবার কথা, লেনা-দেনার কথা আখুন রেখে দে। আমার মাথায় এখন অনেক বড় বড় ব্যবসার কথা ঘুরছে। শুধু শ্মশানের কাজ নয়, তোকে অনেক কাজ করতে হবে। তোর বহুৎ রুপিয়া মিলবে। তোর সব দেনা শোধ হয়ে তো তুই রাজা বনে যাবিরে। তোর লেড়কীকে বলিস আর শুখা থাকতে হবে না। লেড়কীকে পাঠিয়ে দিস, ওকেও কাজ দিব, টাকা পাবে। আমাকে ধরে থাক, তোর দিন ফিরে যাবে।

পদম হা করে তাকিয়ে থাকে নন্দকিশোরের দিকে।

নন্দকিশোর মিটিমিটি হেসে বললেন, তোর লেড়কী তো বেশ রূপবতী—

নন্দকিশোরের হাসি পদমের ভালো লাগেনা। এর কোন লাগসই জবাব দেওয়া যায় কিনা পদম ভাবতে থাকে।

এমন সময় সেখানে শ্মশানের সাধুবাবা এসে হাজির হলেন। নন্দকিশোর সাধুবাবাকে বসার জায়গা দেবার জন্য ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন. বললেন, আসুন বাবাঠাকুর—তারপর চারদিকে তাকিয়ে হাঁক দিলেন, আরে, কে আছিস, ভেতর থেকে একখানা চেয়ার নিয়ে এসে বাবাঠাকুরকে বসতে দে।

সাধুবাবা মোকামের গদির ওপরেই বাঘছাল পেতে বসে পড়ে বললেন, ঠিক আছে, আর চেয়ার নামাতে হবে না। বেশীক্ষণ বসব না, দুটো কথা বলেই চলে যাব। মায়ের পুজোর এখনও সব জোগাড় করা হয়নি। আচ্ছা শুনুন, কাল শনিবার, অমাবস্যা। অন্নের ভোগ, দুপুরে নারায়ণ সেবার সব ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে। হোমের জন্য লাগবে গব্য ঘৃত, চন্দন কাঠ—

—কিছু চিন্তা করবেননা বাবাঠাকুর। একটা ফর্দ করে দেবেন, সব জিনিস হাতের কাছে পেয়ে যাবেন। কাজকর্মের জন্যে শিষ্য-সেবিকাও পাবেন। দুপুরে ডাল ভাজা তরকারি পায়েস চাটনি আতপ অন্ন। ধনী দুঃখী কাঙাল সবার জন্যে। আর রাতে লুচি মোহন ভোগ আলুর দম রাবড়ি মহাজন ভক্তদের জন্যে। এই তো ? আমার লোকজন সব ব্যবস্থা করে দিবে।

—নিশাকালে তো আমি ধ্যানযোগে থাকব। আপনার লোকজন যেন চারদিকে পাহারায় থাকে। মন্দিরে একজন দেয়াসিনী থাকলে ভাল হত। দেখা যাক কী করা যায়। আব শুনুন, এর পরের মাসে আমি তন্ত্রসাধনায় বসব। সময় মত জানাব সব কথা। আপনাকে সব ব্যবস্থা করতে হবে।

নন্দকিশোর বললেন, ঠিক আছে। আর গঙ্গার ওপারের ভক্তদের জন্যে ভাবছি রাতেই পদমের হাত দিয়ে পেসাদ পাঠিয়ে দিব। কী বলেন ? পদমের সঙ্গে আরও দু'চারজনকে পাঠাব।

পদম অবাক হয়ে গেল, বলল, সে কী বাবু! হামি পেসাদ লিয়ে

যাবো কী? হামি তো জাতিতে ডোম! ডোমের ছুঁয়া পেসাদ কেউ খায় নাকি? হামার যে তাতে গুনাহ হবে।

সাধুবাবা বললেন, মায়ের প্রসাদে বামুন-চণ্ডাল ভেদাভেদ নাই। সবাই মায়ের সন্তান। আর পদম, তুই মেয়েকে নিয়ে এসে দু'বেলাই প্রসাদ খেয়ে যাস, কেমন?

পদম বলল, আপকো বহুত মেহেরবানি সাধুজী।

সাধুবাবার বয়স অল্প। কাঁচা গোঁফ দাড়ি চুল। পরনে গরদের ধুতি, গায়ে সিল্কের চাদর, গলায় পৈতে আর রুদ্রাক্ষের মালা, পায়ে খড়ম।

সাধুবাবা বললেন, সামনে শুক্লপক্ষ, পূর্ণিমা তিথিতে ধর্ম মহা-সম্মেলনের আয়োজন করব ভাবছি। সারা শহরের ও দেশ-বিদেশের আপামর গুণীজন, ভক্ত আর শিষ্যরা যাতে দলে দলে এই সভায় যোগ দেয় তার জন্য প্রচার চালাতে হবে। শোভাযাত্রা, নাম-সংকীর্তন ও প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে। সেদিন দীক্ষা দান ও ভাষণ আমিই দেব। এই সম্মেলনকে ভাঙার জন্যে কেউ যেন কোন গণ্ডগোল বা ঝামেলা না-পাকায় সেদিকে আপনার লোকজনদের খর-নজর রাখতে বলবেন। আর আপনার বিশ্বাসভাজন কিছু ভদ্দর-লোকদের নিয়ে একটা নাগরিক কমিটি করবেন। এই কমিটিই সর্বজনের কাছে সম্মেলনকে সফল করার জন্য ডাক দেবে। কিন্তু মূল চাবিকাঠি যেন আপনার হাতে থাকে। এই বুঝে কাজে নামবেন। এ-ব্যাপারে পরে আরও কথা হবে। ভাল করে কাজের ছক কেটে দেব, কিন্তু আপনি নিজে সব তদারক করবেন। তা নাহলে যে-কোন দিক থেকে বিপদ ঘনাতে পারে।

নন্দকিশোর বললেন, ঠিক আছে। রবিবার রাতে আপনার সঙ্গে বসা যাবে।

—আর একটা কথা, শহরের যুবক আর মেয়েদের মধ্যে যাতে ধর্মের মাতন তোলা যায় সে চেষ্টা করতে হবে, ওদের কাজে লাগাতে হবে। এছাড়া সব বয়সের লোকজনকে যাতে টানা যায় তেমন

খোরাকের বন্দোবস্ত করতে হবে। এই পর্যন্ত কথা থাকল। এখন তাহলে উঠি।

সাধুবাবা উঠে পড়লেন। তিনি শ্মশানমন্দিরের দিকে রওনা হলেন। বনপথের ভেতর দিয়ে তাঁর খড়মের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে গেল। নন্দকিশোর সরকার তাঁর গতিপথের দিকে কিছুক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর পদমের দিকে তাকিয়ে বললেন, কত বড় জ্ঞানী পুরুষ, সাক্ষাৎ ভগবান বললেই চলে! শুনলি তো পদম সব কথা? কত কাজ, দেশকে গড়ে তোলার জন্যে তাঁর দিন-রাত ঘুম নাই।

পদম বলল, উসব বাত শুনে হামার কী ফায়দা হবে বাবু?

—হবেরে ব্যাটা আহাম্মক! তোরও ফায়দা হবে। তা নাহলে কি আমি খামোকা এত বাক্যব্যয় করছি? লে, টাকাটা ধর। মনে কর, আগাম তোকে কিছু টাকা দিছি, মেহনত করে শোধ দিয়ে দিস। অবহেলা করিস না। আর শনিবার রাতে গঙ্গার ওপারে ভক্তদের হাতে পেসাদ দিয়ে আসিস।

—বাবু যদি হুকুম করেন তো সাথে যাব, লেকিন হামি পেসাদ ছুঁবো না। হামার সাথে যারা যাবে তাদের হাতে দিয়ে দেবেন, হামি সাথে থাকব।

—বেশ তাই হবে। নন্দকিশোর সরকার ফের পদমের দিকে হাত বাড়িয়ে টাকাগুলো এগিয়ে ধরে বললেন, লে ধর তাহলে, আমাকে আর বিমুখ করিস না বাপধন। জেনে রাখিস, আমার মাথায় অনেক বড় বড় ব্যবসার ফন্দি ঘুরছে। তোকে দিয়েই কিছু কিছু কাজ করাব। তখন দেখবি কাজ করে আর টাকা গুণে কূল করতে পারছিস না। নন্দকিশোর যেন আহ্লাদে আটখানা হয়ে দুলে দুলে হাসতে লাগলেন।

পদম অবাক হয়ে হা করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল, তারপর বলল, কী রকম বাবু?

—সে তোকে পরে বুঝিয়ে বলব। লে আখুন টাকাটা ধর।

অগত্যা পদম হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিল। নন্দকিশোর মিটিমিটি হাসতে লাগলেন।

ঠিক সেই সময় বটগাছের ওপর থেকে ঝুলন্ত বাদুড়গুলো হঠাৎ কর্কশ আওয়াজ করে ডেকে উঠল। বনঝোপের আড়াল থেকে জানোয়ারের ডাক শোনা গেল। দূরে জলার ধার থেকে ডাহুকের ডাক বাতাসে ভেসে আসতে লাগল। একটা মরাগাছের মগডালে শকুনের বিকট ডাক ও পাখসাটের শব্দ শোনা গেল। পদম ওপরে ও চারপাশে একবার তাকাল, তারপর টাকাটা মুঠোয় ধরে ঘরের দিকে পা বাড়াল।

* * *

রসুই বানিয়ে মাটির হাঁড়ি সরা দিয়ে ঢেকে রেখে বাপের জন্যে বসে থাকে টগর। পদম তখনও ফিরছে না দেখে সে অধৈর্য হয়ে ওঠে। ঘরের দরজা বন্ধ করে সে বাপকে খুঁজতে বেরোয়। শুখরামের ঘরেব দিকে যেতে গিয়ে সে বাধা পায়। বনপথের মধ্যে ওর পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে হুলো আর ঢ্যাং। ওদের অদ্ভুত প্রস্তাবের কথা শুনে ভয়ে ও রাগে টগর কাঁপতে থাকে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে টগর নিজেকে সামলে নিল, তারপর শাড়ির আঁচলটা ভালভাবে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে বলল, রাস্তা ছোড়্ দো বেতমীজ বেলেল্লা কাঁহিন্‌কা!

হুলো বলল, আই বাপ্! মারবা নাকি গো? তুমি তো সুন্দরী মাইরি, অত গোঁসা না-করে হাসি-হাসি মুখে কথা বলো না ক্যানে! সরকার তুমাকে একবার শুধু দেখতে চেহেছেন। যাবা আর দেখা করেই চলে আসবা। ডর কিসের? আমরা তো আছি। সাধুবাবার চন্নামিত্ত খেতে পাবা—

ঢ্যাং বলল, একবার গিয়েই দেখনা ক্যানে মাইরি, যদি বেফালতু কিছু টাকা কাপুড় গয়না আদায় হয়তো দোষ কী? সরকার বলেছে একবার তুমাকে শুধু চোখে দেখবে। ব্যস্! ফুরিয়ে গেল কীত্তন। সরকার ভালো মানুষ, তুমার কুনো ক্ষতি করবে না। তাছাড়া আমরা

থাকতে তুমার কুনো ভয় নাই জানবা, কেউ তুমাকে বেইজ্জত করতে পারবে না।

হুলো বলল, রূপচাঁদ তুমার পেয়ারের লোক তা আমরা জানি বলেই তো তুমাকে এত্তটা ভরসা দিতে পারছি। সে আমাদের দলের না-হলেও লাইনের তো বটে! তার ইজ্জত রাখব না আমরা?

ঢ্যাং বলল, কিন্তু রূপচাঁদ এখন এসে পড়লে তো ফের ঝামেলা হবে রে হুলো।

হুলো বলল, হ্যাঁ, সে ভয় তো আছে! এই টগর, জলদি করো মাইরি!

ঢ্যাং বলল, খুশীমনে না গেলে আমরা তুলে লিয়ে যাবো বলে দিলাম।

টগর জোর গলায় বলল, ইয়াদ রাখো, রাস্তা না-ছোড়লে হামি চিল্লিয়ে লোক জড়ো করব।

হুলো আর ঢ্যাং টগরের কথায় এত্তটুকু বিচলিত হল না। বরং ওরা আরও কয়েক পা এগিয়ে এসে টগরকে জাপটে ধরতে চাইল। কিন্তু টগর আচমকা ওদের দু'জনকে দু'হাতে প্রাণপণে ধাক্কা মেরে ঊর্ধ্বশ্বাসে শুখরামের ঘরের দিকে ছুটতে থাকল! টগরের আচমকা ধাক্কায় ওরা প্রথমে কিছুটা থতমত খেল। তারপর টগরকে ধরবার জন্যে ওরাও পিছু পিছু ছুটল।

শুখরাম ঘরে নাই। রূপচাঁদ সবেমাত্র দরজা খুলে ঘরে ঢুকেছে। টগর খোলা দরজা দিয়ে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে খিল বন্ধ করে দিল। তারপর দরজায় পিঠ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগল। টগরের দীর্ঘ কালো চুলের এলো খোঁপা খুলে পড়েছে, আলুথালু বেশবাস, কপালে ও নাকের ডগায় বিন্দুবিন্দু ঘাম জমেছে, উদ্ধত বুক শ্বাস-প্রশ্বাসে ওঠানামা করছে, ভীত চোখ আর ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে। টগরের রূপের জেল্লা যেন এখন শতগুণ বেড়ে গেছে।

রূপচাঁদ সবেমাত্র ঘরে ঢুকে তখনও পোশাক ছাড়েনি। সে পিছন

ফিরে টগরকে এই অবস্থায় দেখে অবাক হয়ে গেল, বলল, আরে ঃ টগর! কেয়া ব্যাপার? কুছু অগড় বগড় ঘটল নাকি?

টগর হাঁফাতে হাঁফাতে শুধু বলল, ইল্লৎ, উল্লুক বেল্লিক বেতমীজ কাঁহিনকা!

রূপচাঁদ আরও অবাক হল টগরের কথা শুনে, বলল, ক্যা, মুঝে বোল্ রহী হো?

—নহী। টগর হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, তুমাকে ইসব বলতে যাবো ক্যানে?

—তব্ এইসব কাকে বলছ টগর? হামি কুছু দোষ করে থাকলে বলবা তো?

—তুমহি না, সেই উল্লুক সরকারের পুষা গুণ্ডা দুটা হামাকে তাড়া করেছে।

—ক্যানে, কী হয়েছে? কেয়া বোলা তুমকো?

টগর হাতের ইশারায় রূপচাঁদকে থামিয়ে বলল, হামাকে থোড়া দম লিতে দাও, পরে তুমহাকে সব কথা বলছি।

রূপচাঁদ চুপ করে টগরের দিকে তাকিয়ে থাকে। টগর সত্যিই রূপসী। ছেলেবেলা থেকেই ওদের দু'জনের মধ্যে মেলামেশা ভাব আলাপ ছিল। কিন্তু টগর যুবতী হবার পর থেকে রূপচাঁদ আজকের মতো এত কাছে থেকে ওর দিকে ভাল করে তাকায়নি। এর মধ্যে কতবার তো রূপচাঁদের সঙ্গে টগরের দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে, মাঝে মধ্যে দূর থেকে মৃদু একটু হাসি বিনিময়ও হয়েছে। ব্যস্, ওই পর্যন্ত। তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু কখনও এমনভাবে যুবতী টগরের দিকে তাকাবার সুযোগ রূপচাঁদের জীবনে আসেনি। এখন দেখল এবং দেখতে দেখতে রূপচাঁদের চোখে যেন কিসের নেশা লেগে গেল। টগরের রূপের নেশায় রূপচাঁদের দেহের প্রতিটি লোমকূপে যেন রোমাঞ্চ জেগে উঠল।

টগরও রূপচাঁদের চোখের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে। সুপুরুষ রূপচাঁদকে দেখে ওর মনের ভয় দূর হয়ে গেছে, বুকটা অসীম ভরসায়

ভরপুর হয়ে উঠেছে, আর কী-একটা ভাল-লাগার আনন্দে যেন মনটা টইটম্বুর হয়ে উঠছে ক্রমশ। টগর লজ্জায় চোখ নামায়। রূপচাঁদের যেন সম্বিত ফিরে আসে।

রূপচাঁদ বলল, সেই উল্লুকরা কুথায় আছে টগর?

টগর বাইরের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল, উরা হামাকে সরকারের কাছে জোর করে ধরে নিয়ে যেতে চায়, বলে, গেলে নাকি বহুত রুপিয়া মিলবে। ইয়ে কেয়া বাত হ্যায় উওলোগকা!

রূপচাঁদ একটা ছুরি প্যাণ্টের হিপ্-পকেটে গুঁজে নিয়ে বলল, টগর, তুমহি দরওয়াজা খুলে দাও, হামি শালা শুয়োরের বাচ্চাদের খতম করে আসি। বড্ড দিমাগ্ বেড়েছে হারামীদের। তুমহি থোড়া হট্ যাও, হামি দরওয়াজা খুলব।

—না, রূপচাঁদ না, উরা যদি তুমহাকে খতম করে দেয়।

রূপচাঁদ হেসে বলল, এইসা বুকের তাকত উ শালাদের নাই। হামি সিধা দাঁড়ালে শালারা সব নেড়ী কুত্তার মতন পালিয়ে যাবে। হামার দলের বহুত জোর আছে।

—অত হিম্মত ভাল না, তুমহি আখুন একেলা আছো, উরা খতম করে দিলে তুমহার দল কী করবে? পাল্টা খতম করবে। লেকিন তুমহাকে তো আর ফিরে পাবো না। না, তুমহাকে হামি যেতে দিব না। যদি যেতে চাও তো হামাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে যাও।

রূপচাঁদ হেসে বলল, বেশ বাধা দিলে যাবো না, কিন্তু কী হয়েছে বলবা তো? তুমহাকে উরা বেইজ্জত করবে আর হামি সহ্য করব?

টগর এবার দরজা ছেড়ে রূপচাঁদের কাছাকাছি এগিয়ে এল। সে বুঝেছে এই টালমাটাল দুনিয়ায় রূপচাঁদ ছাড়া ওকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। সে বলল, যদি সহ্য করতে না পারো তো হামাকে বাঁচাও। বললাম তো, উরা হামাকে সরকারের কাছে যেতে বলছে ক্যানে তা বুঝতে পারছ না? আউর সাধুবাবা তো খুব বদমাস আদমি! ইসব খবর রাখো না? একঠো আউরতকে বাঁচাতে পারো না, তো কেমুন মরদ? খালি ফালতু মাস্তানি!

—দেখো টগর, হামার জান থাকতে কুনও আদমি কখুনও তুমহাকে বেইজ্জত করতে পারবে না। তাহলে সব খতম হয়ে যাবে, কোই আদমি রেহাই পাবে না।

—ব্যস্! তাহলেই হামাকে বাঁচানো যাবে? তুমহাকে লিয়ে পুলিশ জেল হাজত দিবে, কি তুমহি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে···তো হামি কেমুন করে বেঁচে থাকব?

রূপচাঁদ কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। এ কথার কী জবাব দেবে সে বুঝতে পারলনা। টগর রূপচাঁদের আরও কাছাকাছি ঘন হয়ে এসে দাঁড়াল। রূপচাঁদের বুকের ওপর টগর একবার ডান হাতটা আলতোভাবে রাখল, তারপর ধীরে ধীরে দুটো হাত কাঁধের ওপর তুলে দিয়ে বলল, তুমহার তাকত আছে, বুকে বল আছে, লেকিন একঠো লেড়কীকে কী করে বাঁচাতে হয় সে বুদ্ধি তুমহার নাই।

রূপচাঁদের সমস্ত শরীরটা কেমন যেন আনচান করে উঠল। অথচ ছেলেবেলায় খেলার ছলে দু'জনে কত জাপ্টাজাপ্টি করেছে, এমন তো ঘটেনি কখনও। বড় হয়ে সে জীবনে কোন নারীর স্পর্শ পায়নি। এখন টগরের স্পর্শে ওর সারা শরীরে চোখেমুখে কী একটা অপূর্ব মাদকতার আমেজ ছড়িয়ে পড়ল। সে দু'হাত দিয়ে টগরের মাথাটা ধরে চুলের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে দিয়ে বলল, তুমহি বলে দাও।

টগরের এত রূপ, এই ভরা যুবতী শরীর এতদিন কোন পুরুষের স্পর্শে পবিত্র হয়নি। সে চিরকাল মনে মনে রূপচাঁদকে চেয়েছে, ভালবেসেছে, ওকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে। ছেলেবেলায় খেলাধুলোর দিনগুলোতে ভাল-লাগা ছিল, কিন্তু এই ভাল-লাগা তো অনাস্বাদিত, যেন অনন্ত। টগর হয়ত এতকাল এই প্রতীক্ষায় দিন গুণত। এখন, এই প্রথম রূপচাঁদের স্পর্শে ওর শরীরের শিরায় শিরায় যেন কী একটা শিহরণ খেলে গেল। টগর দু'হাত দিয়ে রূপচাঁদের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, হামি বলব ক্যানে? তুমহি বুঝে লাও।

—হামি বুঝতে পারছি না।

—তুমহার পেয়ার তো নাই, তাই বুঝতে পারো না।

রূপচাঁদ এবার ছ'হাত দিয়ে টগরকে জড়িয়ে ধরল। টগরের বুকে, গলায়, গালে কপালে মুখ ঘষতে ঘষতে রূপচাঁদ টগরের ঠোঁটে প্রচণ্ড আবেগে অনেকক্ষণ ধরে চুমু খেল। ওদের উভয়ের ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস পড়তে লাগল। টগরের গলা দিয়ে বড় তৃপ্তি ও সুখের ধ্বনি ফুটে উঠল। টগর এখন নিজেকে যেন রূপচাঁদের কাছে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিতে চাইল।

রূপচাঁদ একবার মুখ তুলে টগরের দিকে তাকাল, বলল, হামারও পেয়ার আছে টগর, তুমহি জানো না। রূপচাঁদ ফের টগরের ঠোঁটে চুমু খেল।

টগর রূপচাঁদের মুখটা ঈষৎ সরিয়ে দিয়ে বলল, যদি থাকে আর হামাকে বাঁচাতে যদি মর্জি হয়, তো—

রূপচাঁদ ফিস ফিস করে বলল, তো কী ?

টগর বলল, আনখা কাম ছোড়কে নোকরি করো, কি চাহি ঠিক-ঠিক বেওসা করো। তারপর···টগর লজ্জায় চোখ নামিয়ে বলল, শাদী করো, ঘর গেরস্তালি করো—

টগরের কথায় রূপচাঁদ মৃদু একটু হাসল, তারপর বলল, আচ্ছা টগর, তুমহি ক্যায়সে বুঝলা হামি আনখা কাম করে বেড়াই ? ফালতু মাগনা কাম ম্যাঁয় নহী কর্‌তা হুঁ টগর।

টগর রূপচাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে। এমন সময় বাইরে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা যায়। শুখরাম ও পদমের গলার স্বরও ভেসে আসে। টগর আলুথালু কাপড় ঠিকঠাক করে কোমরে জড়িয়ে নেয়, এলো চুল আলগা খোঁপা করে বাঁধে। রূপচাঁদ দরজা খুলে দেবার জন্যে এগোয়।

শুখরাম ঘরের বাইরে থেকেই বকবক করতে শুরু করেছে: আরে তু কেয়া কর্‌ রহা হ্যায় রে নবাবকা বেটা, জলদি দরওয়াজা খোল্। তামাম মুলুক ঢুঁড়ে তো হামলোগ বিলকুল হলাকান হয়ে গিয়েছি। তেরা হালচাল তো হামার মগজমে কুছু ঢুকছে না। কেয়া বে বেটা, আজ ঘরমে খানাপিনা হোগা, কি নহী ? তেরা কেয়া মতলব হ্যায় ?

ঘরের বাইরে থেকে শুখরাম একটানা বকবক করতে থাকে। দরজা খুলতেই বেটা রূপচাঁদকে দেখে সে আর মুখ খোলে না, যেন একটু চুপসে যায়। বরং বলা যায়, জোয়ান মরদ বেটা রূপচাঁদকে শুখরাম যেন মনে মনে একটু ভয়ই পায়। একটা আড়াল বা সঙ্গীসাথী না-জুটলে মনের ঝাল মিটিয়ে বেটাকে দু'কথা শোনাতে পারে না। এখন দরজার আড়াল এবং দোস্ত পদম দু'টোই একসঙ্গে জুটে যাবার ফলে শুখরাম বেশ প্রাণ খুলে বেটাকে কথা শুনিয়ে দেয়। কিন্তু দরজা খুলতেই সামনে বেটাকে দেখে ওর তেজ উবে যায়। সে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করে : তু কাঁহা থা, কেয়া কাম কর্ রহা থা রে বেটা?

রূপচাঁদ কোন উত্তর দেয় না। রূপচাঁদের পিছনে টগরকে দেখে অবাক হয়ে যায় শুখরাম। শুখরাম পদমকে লক্ষ্য করে বলল, আরে বড়া তাজ্জব কী বাত হ্যায় ভাইয়া, ঘরকা অন্দরসে এত রোশনি আসছে কুথা থেকে? তারপর একটু থেমে বলল, আখুন মালুম হল বেটা খুব টাইট্ খেয়েছে।

পদম টগরের দিকে তাকিয়ে বলল, তু ইধর ক্যায়সে এলি বেটি?

টগর পদমের কথার কোন জবাব দিল না। রূপচাঁদও চুপ করে রইল। শুখরাম একটু রসিকতা করে বলল, পয়দলমে, জৈসে কর্কে আদমি লোগ আসা যাওয়া করে। তারপর সে যেন খুব বড় ধরনের একটা রসিকতা করতে পেরেছে এইরকম মনোভাব নিয়ে হেসে হেসে নিজেই নিজের কথার তারিফ করতে লাগল।

কিন্তু কেউ হাসল না, কিংবা পদমও ওর কথার কোনো জবাব দিল না দেখে সে যেন একটু অপ্রতিভ হল, তারপর পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, এসেছে তো ভালই হয়েছে। আজ হামার রসুই বানানো হয়নি। আজ হামলোগ সব আরাম কর্কে টগরের হাতের রান্না খাব। তারপর শুখরাম টগরের দিকে তাকিয়ে বলল, এ বেটি, তুমহারী যো কুছ রসুই বানানো হয়েছে, উস্মে হামলোগকা সবকো খানাপিনা হো যায়েগা, কী নহী?

টগর মৃদু একটু হেসে বলল, জরুর হো যায়েগা। হামি তো

দো আদমিকো লিয়ে দো বেলার রান্না সেরে লিয়েছি। তো চারো আদমিকো খানা এক বেলামে কিঁউ নহী হোগা ?

—তব্ তো বহুত আচ্ছা, চল্ বেটা রূপচাঁদ খানাপিনা সেরে লিই। আউর রাতমে একঠো বঢ়িয়া খানাপিনা হামলোগকা ঘরমে সবাই করবে, হামি সবকো রান্না করে খাওয়াব।

টগর বলল, নহী, ইস তরফমে তখুন হামি রসুই বানাব।

পদম এবার মুখ খুলল, বলল, বহুত খুশীকী বাত হ্যায়। তব্ আভি সব চলো খানাপিনা সেবে লিই। তারপর টগরের দিকে তাকিয়ে বলল, চল্ টগর, তু ইখানে ক্যানে এসেছিলিস্ তা হামি সমঝ গিয়েছি। তুর একেলি ঘরমে থাকতে বহুত ডর লাগে! তাই মুঝে তলাশ করনেকা লিয়ে তু ইধর আ গয়ী থী ?

দোস্ত শুখরাম এবার হা হা করে উঠে বলল, আরে ছোড়্ দো ভাইকা উসব বাত, হামলোগ তো বুড়া হো গয়া, তুমকো কেয়া সামঝানা হ্যায়! আভি চলো তো, মেরা বহুত ভুখ লাগ্ গয়া, বহুত! আবে বেটা রূপচাঁদ, তু আগে চল্।

*　　　*　　　*

আগামীকাল শনিবার। শ্মশানকালীর পূজো। মহাধুমধাম। বলা যায় ধুন্ধুমার কাণ্ড। সকালে প্রসাদ বিতরণ, দুপুরে অন্নের ভোগ, নরনারায়ণ সেবা, রাতে ধনী মহাজন ভক্তদের জন্য এলাহি আয়োজন। পদম আর দোস্ত শুখরাম ঠিক করল সকালে মায়ের প্রসাদ নিতে যাবে, দুপুরে পংক্তি ভোজে বসবে, রাতে যদি ছাঁদা মিলে তো ভাল, নচেৎ যে যার ঘরে রসুই বানিয়ে খাবে। দোস্ত শুখরাম সাঁঝের বেলায় বাজারে কিছু সওদা করতে যাবে। ফাঁক-ফিকির পেলে কিছু মতলব নিয়ে কোন আমীর আদমির সঙ্গে ভেট করে নিবে। পদম যাবে রাতকালে গঙ্গার ওপারে প্রসাদ নিয়ে। কারণ নন্দকিশোর সরকারের সঙ্গে সেই-রকম সল্লাপরামর্শ হয়েছে। দোস্ত শুখরাম প্রস্তাব করল, পদম যতক্ষণ ফিরে-না-আসবে ততক্ষণ টগর তার জিম্মায় থাকবে। এসব কথা রাতে শুখরামের ঘরে বসে সবাই মিলে একসঙ্গে খাবার সময় ঠিক হল।

রূপচাঁদ জানাল সে আজ রাতে খানাপিনা সেরে জরুরী কাজে রওনা হয়ে যাবে। সে সারারাত থাকবে না। পরদিন শনিবার সাঁঝ লাগার আগেই ঘরে ফিরে আসবে। সুতরাং আজ রাতে সবাই যেন সজাগ থাকে। শুধু তাই নয়, সে ফিরে না-আসা পর্যন্ত সকলকে সাবধান থাকতে হবে, চারদিকে নজর রেখে চলতে হবে। সে বলল, ইয়াদ রাখো, দিনকাল খুব ভালো নয়।

শুখরাম শুনে বলল, ইয়ে ঠিক বাত হ্যায়। গরিব আদমির দুষমন চারো তরফমে খাড়া আছে। হামি তো বুড্ঢা হয়ে গিয়েছি। রূপচাঁদ যদি কাল জলদি, কি ধরো শামকো থোড়া আগে ঘরে ফিরে আসে তো হামি এ-বেটির জিম্মা উসকো হাতমে ছোড়্কে তব্ বাহার যাব পদম ভাইয়া। হামাব ফিরতে থোড়া রাত হলেও ভয়ডর থাকবে না। লেকিন রূপচাঁদ ঘরে ফিরলে তব্ হামি শহরমে যাব। আউর তুম ভি নিশ্চিন্তে গঙ্গাকী উস্ পারমে পেসাদ লিয়ে যেতে পারবে। সমঝা না পদম ভাইয়া? কাল তো রসুই বানানোর ঝামেলা থাকবে না। হামবা সব একসাথে পেসাদ খেয়ে আসব।

রূপচাঁদ বলল, গঙ্গাকী পারমে ওনার কী এমুন কাম আছে? এইসা কৌন্ জরুরত হ্যায়! হামার মগজমে তো কুছু ঢুকছে না। কিসের পেসাদ? কৌন্ আদমি দেওতাকো দিব্যি দিয়ে পেসাদ খেতে যাবার কথা বলেছে? ঘরমে রসুই বনাকর আপ্লোগ সব খা লিজিয়ে। উসব ঝামেলাতে যাবার কেয়া দরকার?

রূপচাঁদ কথাগুলো বলে খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল এবং বেরোনর জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল।

দোস্ত শুখরাম আর পদম দু'জনেই রূপচাঁদের কথায় অবাক হয়ে গেল। শুখরাম বলল, রাম, রাম! ইয়ে কেয়া বাত হ্যায় রে? মায়ের পেসাদ মাথায় তুলে না-নিলে যে গুনাহ হবে রে!

—লবঘণ্টা হবে! উসব সাধু আর সরকারের বুজরুকি। উরা দো আদমি একসাথমে একঠো ধান্দাবাজির আখড়া খুলেছে। কেহু জানে না, লেকিন হামার কাছে সব খারাপ রিপোর্ট আছে।

শুখরাম লেড়কার কথা শুনে কানে আঙুল দিয়ে বলল, হায় রাম, আবে গুনাহ হবে রে ! বেটা হারামী, তুর নরকবাস হবে। আরে আদমি পাপ করলে সাজা পাবে, লেকিন কালীমায়ীর পেসাদ পাওয়া তো উঁচা নসীবের বাত !

পদম বলল, কাঙাল দুখী মাহাজন দলে দলে বহুত আদমি আসবে, সবাই তো মায়ের পেসাদ খাবে। কালীমায়ীকী পেসাদ, অন্নের ভোগ! তো এতে কী দোষ আছে বেটা রূপচাঁদ ?

—আপ্‌লোঁগকো কুছ্ মালুম নহী হ্যায়। মায়ের পূজোর নামে উন্‌লোগ বহুত নষ্টামী জুড়েছে। দোনো আদমিকো হামরা একদিন ঠাণ্ডা বানিয়ে দিব। যারা যেতে চায় যাক, পেসাদ খাবার ইচ্ছা হলে খেয়ে আসুক, হামার কী বলার আছে। আপ্‌লোঁগকো যানেকা আউর খানেকা মতলব হ্যায় তো হামি আর কী বলবে! লেকিন টগরকে লিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। এ হামি সাফসুফ বলছি। টগর ছোটী লেড়কী নহী, উসকী উমর বেড়েছে, এটা ইয়াদ রাখা দরকার। ম্যাঁয় ফির বোল্ রহা হুঁ কি দুষমন জানোয়ার কা মাফিক খাড়া হ্যায়। অন্ধেরা হলেই উ শালারা হামাদের লহু চুষে খাবে। সাবধানে না-থাকলে বিপদ আসবে বলে যেছি।

রূপচাঁদ ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। দোস্ত শুখরাম ও পদম দু'জনেই অবাক হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। টগর মাথা নিচু করে বসে থাকে।

দোস্ত শুখরাম বলল, হায় রাম! এ পদম ভাইয়া, হামার নসীব দেখো! হামার একঠো লেড়কা, উসকী বাত শুনো! আভি সমঝ লিয়া তো, ক্যানে হামি তুমহার কাছে আর শাদীর কথা বলতে যাই না। দো-চার মাহিনাতক দেখছি, বেটা নোকরি ছোড়্‌কে কেয়া কামমে ইধর উধর ছুটাছুটি করছে, হররোজ লাফঝাঁপ মারছে। কেয়া কাম ভগ্‌মান মালুম! তো পুছলে কুনো জবাব দেয় না। ফির ইধর তো গুছাগুছা রুপিয়া লিয়ে আসছে। কাঁহাসে রুপিয়া মিলছে বা! কি চোরি-ডাকাতি করছে, কি চোরাই মাল পাচার করছে, কৌন

বোলে গা ! ইসব দেখেশুনে উ বেটার সাথে শাদী দিয়ে কি ভাইয়া একঠো লেড়কীকে হামি গঙ্গাকী পানিমে ভাসিয়ে দিতে বলব ? নহী, জান থাকতে ইসব কাম হামি করতে পারব না।

—ইয়ে তো বহুত মুস্কিলকী বাত হ্যায় দোস্ত ! ম্যাঁয় তো পহেলে কভি নহী শুনা কি রূপচাঁদ বেআইনি কাম কর্ রহা হ্যায়। উসকো আভি রুখ্ দো, নহী তো পুলিশ কী হুজ্জত হোগা, জেল-হাজত হো যায়ে গা। ইয়ে তো আচ্ছা কাম নহী হ্যায় !

—কৌন উ লেড়কা কো রুখে গা ? তুমহি বলো দোস্ত! উ লেড়কা তো দেওতা মানে না, সাধুজী-গুরুজী মানে না, ছুরি-চাকু পিস্তল-মাস্তান লিয়ে ঘুরে। কৌন উসকো রুখেগা ? তুম বতাও দোস্ত, ম্যাঁয় কেয়া করুঁ, কাঁহা জাউ, মেরে সমঝমে তো কুছ্ নহী আতা। তারপর চোখমুখ মুছে শুখরাম বলল, জেনেশুনে হামি ই শাদী দিতে পারব না ভাইয়া।

পদম বলল, ইয়ে তো হামারও বাত হ্যায় দোস্ত। লেকিন দুসরা লেড়কা কাঁহা মিলেগা।

—ভিন্ দেশমে যাও, ঢুঁডকে দেখো। হামি আর কী বলব ? হামার বুকে উ লেড়কা ঝান মেরেছে, হামার সুখের নিদ কেড়ে লিয়েছে। হামি আর তুমহাকে কী দিয়ে বুঝাবো বলো ?

পদমের কপালেও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। সে টগরের দিকে তাকিয়ে বলল, কেয়া রে বেটি, তু কুছ্ সমঝা ? হামার দিমাগ খারাপ হয়ে গিয়েছে। কৌন্ উসকো শায়েস্তা করে গা ?

শুখরাম বলল, উ লেড়কা বিলকুল জাহান্নামে চলে গিয়েছে। উ বেটা কো শায়েস্তা কর্না বহুত মুস্কিল হ্যায়। টগর ক্যানে, কেহু পারবে না। উসকা সাথ শাদী হোনেসে একঠো লেড়কী কী জিন্দেগী বিলকুল খতম হো যায়েগী। হামি তো উসকো বাপ আছি, লেকিন সচ্ বাত বলতে হামি কসুর করি না। একঠো লেড়কীকে ভাসিয়ে দিলে হামাদের দোনো আদমিকো গুনাহ হবে ভাইয়া, সমঝে দেখো।

টগর মাথা নিচু করে বলল, ইয়ে আপলোঁগকো ঠিক বিচার

নহী হ্যায়। রূপচাঁদ তো জওয়ান মর্দানা, শির উঁচা রাখকে সিধা রাস্তেমে বেঁচে থাকতে চায়, লেকিন বাঁচা বহুত মুস্কিল। দিনকাল জাহান্নামে চলে গিয়েছে। কে কাকে শায়েস্তা করবে? কে সাচ্চা পথ বাতলাবে? শায়েস্তা করতে হলে এই সব রহিস আদমি, উসকো কানুন আউর দিনকালের সাথে লড়াই করা দরকার। ফালতু রূপচাঁদকে দায়ী করে কী লাভ?

পদম বলল, তু এত্‌না খবর জেনে লিয়েছিস? তো আজ ও বলাতে তু নিজে রূপচাঁদের কাছে এসেছিলিস্, নাকি রূপচাঁদ তুকে ডেকে লিয়ে এঁসেছিল? বাতচিত কী হল তা হামাকে তো আভিতক তু কুছু বলিস নাই।

টগর বলল, রূপচাঁদ সব বলবে, হামি বলতে পারব না।

শুখরাম বলল, আগেও কী তুমহাদের ইভাবে মুলাকাত হয়েছে?

টগর এবার মাথা তুলে রোষ-মিশ্রিত কান্না-কাঁপা গলায় বলল, নহী, কভি নহী!

পদম বলল, শাদী হোক, কি চাহি নাই হোক, তুকে তো ইভাবে আর রূপচাঁদের সাথে মিলঝুল করতে দিতে পারব না। তুমহি কী বলো দোস্ত, কাজটা তো গুনাহ বটে!

—জরুর! শুখরাম বলল, হামি ভি লেড়কাকে বলে দিবো, ইয়ে কাম সব ঠিক নহী হ্যায়। তুমরা যদি শাদী করতে চাও তো কর্‌লো, হামরা দিতে পারব না, তারপর দোনো হাত পাকড়কে জাহান্নামে চলা যাও। তারপর ভাইয়া, হামরা ভি দো আদমি দেওয়ানা হয়ে চলে যাব। লেকিন জেনেশুনে তুমাদের জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়ে হামরা দুজনা দোজখে যেতে পারব না।

টগরের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে থাকে। পদম আর দোস্ত শুখরাম পরস্পর আলোচনায় মত্ত হয়। ওরা দুজনেই আজ নিজের চোখেই দেখেছে। দুই সোমত্ত লেড়কা-লেড়কী ঘরের দরওয়াজা বন্ধ করে কতক্ষণ ছিল কে জানে! এভাবে থাকা যে কত বড় গুনাহ তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। এর জন্য দু'জনেরই

প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার। কিন্তু আলোচনার শেষে ওদের দু'জনের কেউ আর দরজা বন্ধ করার কারণ টগরকে জিজ্ঞাসা করে না। কারণ, হাজার হলেও ওরা দু'জনেই বাপ তো বটে! পুরুষ মানুষ, ধর্মভীরু গুরুজন। এসব প্রশ্ন সোমত্ত মেয়েকে মায়েরা তবুও করতে পারে, কিন্তু ওদের দু'জনের কারও তা করা শোভা পায় না। তাই প্রসঙ্গ বদলে ওরা অন্য কথায় যেতে চায়।

টগর পদমকে লক্ষ্য করে বলল, মুঝে একেলি ঘরমে ছোড়্‌কে আপ্‌না খুশীসে তুম তো বাহারমে চলা গয়ে থে। লেকিন যানেকা বাদ যা ঘটল, রূপচাঁদ না-থাকলে আজ হামার জান খতম হয়ে যেত। রূপচাঁদ ছাড়া হামাকে কেউ বাঁচাতে পারত? সে ছাড়া হামাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না!

—ক্যানে, কী হয়েছিল?

—রূপচাঁদ কো পুছো, সব বলবে। হামি বলতে পারব না।

শুখরাম বলল, ছোড়্‌ দো ভাইয়া, কুছু গড়বড় হয়েছে, পরে জানা যাবে। তবে সোমত্ত বেটি, উসকী একলি ঘরমে ছোড়্‌খে বাহারমে যানা ঠিক নহী হ্যায়। তো হামি বলছি কি রূপচাঁদ ফিরে এলে তাহলে একঠো ফয়সালা করে লাও, ইসব ঝুটঝামেলা চুকা দো।

পদম বলল, ঠিক হ্যায়। তারপর টগরের দিকে তাকিয়ে প্রসঙ্গ বদলে বলল, কীরে, তাহলে তু হামাদের সাথে কালীমায়ীকী পেসাদ খেতে যাবি তো?

টগর কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখমুখ মুছে বলল, হামি জানি না।

টগরের চোখে জল দেখে পদমের মনটা যেন কেমন আনচান করে ওঠে। বড় কষ্টে সে এতকাল এই কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়েকে পরম আদরে বুকে করে লালন-পালন করে এসেছে। টগরও সে কষ্টের কথা সবই জানে। টগর পদমের মেয়ে, যেন তারই রক্ত ছেঁড়া ধন। এছাড়া তার অন্য কোন পরিচয় নাই। টগরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পদমের কোথায় যেন বাধে। কারণ টগর এখন সোমত্ত হয়ে উঠেছে, ওর জ্ঞানগম্যি হয়েছে। যদি সে অন্যরকম ভাবে, যদি সে দুঃখ পায়!

পদমের তো এ-ছুনিয়ায় আর কেউ নাই। তাই পদমের মনটা ঈষৎ নরম হয়।

পদম বলল, কীরে বেটি, তু মনে বড় ছুখ পেয়েছিস? কী ঘটেছিল তা না-জেনে হামি যদি কুছু বলে থাকি তো সেটা ভুল হয়েছে। হামি তুর বুডঢা বাপ, দোস্ত ভি বুডঢা হয়ে গিয়েছে। তো বুডঢা আদমিকো কসুর হতে পারে। তু জওয়ানী হো গয়ী, বলি কি, তু মনে কুছু ছুখ লিস না। এ বেটি, রোনা মাৎ! তু কাঁদলে মনটা হামার আনচান করে। হামার যে আর কেহু নাইরে বেটি। এ সংসারে তু ছাড়া হামার কেহু নাই।

টগর বাপের কথায় এবার চোখে-মুখে আঁচল ঢেকে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল, বলল, উসব বাত বলছ ক্যানে? হামার মনে বড় ছুখ লাগে—

টগরের ওপর শুখরামের স্নেহ-মমতাও বিন্দুমাত্র কম নয়। শুখরামের তো নিজের মেয়ে নাই। তাই ছেলের বৌ ক'রে টগরকে ঘরে এনে শ্বশুর হিসেবেও যদি পিতৃ-হৃদয়ের ক্ষুধা মেটানো যায়, তো মন্দ কী! তাই টগরের মত হাসিখুশী মেয়ের চোখে জল দেখে শুখরামের বুকের ভেতরটাও কেমন যেন বেদনায় ভরে উঠল। সে পদমকে থামিয়ে দিয়ে বলল, ফালতু বাত ছোড়্ দো ভাইয়া। তারপর টগরের দিকে তাকিয়ে শুখরাম বলল, হামি আউর পদম পেসাদ খেতে গেলে তুম ঘরমে একেলি থাকতে পারবা তো?

টগর মাথা নিচু করে বলল, আজকাল দিনসময় বহুত খারাপ হয়ে গিয়েছে। আখুন একেলি ঘরমে থাকতে কি বাহারমে যেতে হামার বড় ডর লাগছে। চারো তরফমে বহুত নয়া উৎপাত শুরু হো রহা হ্যায়। সব সমাচার আপলোঁগকো সমঝমে জলদি আ যায়ে গা।

—তব্ তো খুব মুস্কিলকী বাত হ্যায় ভাইয়া! শুন পদম, হামি তুমহারী বেটিকী পাশ পাহারা রহেগা, তুম একেলা পেসাদ লিতে যাও। হামাদের পেসাদ যদি মিলে তো দিয়ে যাবা। আউর বেটা রূপচাঁদ ফিরে এলে উ পাহারা থাকবে, উসকো জিম্মায় টগরকে রেখে

তবে হামি বাহার যাব। তুমহারী বেটির যখুন ডর লাগছে, তো এই হস্ন সিধা রাস্তা, উপায় নাই। তুসরা মতলব আভি ছোড়্ দো ভাইয়া।

পদম বলল, ঠিক হ্যায়। তারপর টগরের দিকে তাকিয়ে বলল, তু কী বলিস বেটি ?

টগর মাথা নিচু করে রইল, কোন জবাব দিল না। কিন্তু মনে হল একটা পরম খুশীর হিল্লোলে ওর সর্বাঙ্গ যেন দুলে উঠল, যেন কোন নিঃশব্দ রাগিনীর অনুরণন ওর রক্তস্রোতে শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হয়ে গেল, ওর সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একটা উজ্জ্বল আলোয় ভরপুর হয়ে উঠল। পদম ও শুখরাম তু'জনেই হতবাক হয়ে টগরের দিকে তাকিয়ে রইল।

*　　　*　　　*

পরদিন শনিবার। ভোর বেলায় পদম একা মন্দিরে গিয়ে মায়ের পূজো দেখল, প্রসাদ নিল। শুখরাম আর টগরের জন্যে গামছায় বেঁধে প্রচুর পরিমাণে ফলমূল নিয়ে এল। তুপুরেও পদম পংক্তি ভোজে খেতে বসল না।

নন্দকিশোর সরকার ব্যস্ততার মধ্যেও একবার এসে পদমকে জিজ্ঞাসা করলেন, কীরে পদম, তোর মেয়ে এল না ? শুখরামকেও তো দেখছি না। কী ব্যাপার তোদের বলতো ?

পদম বলল, থোড়া অসুবিধা আছে বাবু, হামি অন্নের ভোগ ঘরে লিয়ে যেয়ে খাব।

—সে কী ! তোরা কেউ পংক্তি ভোজে বসবি না ? ক্যানে, কী হল তোদের ? ইখানে বামুন-চণ্ডাল কুনো ভেদাভেদ নাই রে, সবাই পংক্তি ভোজে বসবে। তবে তোদেরকে একটু দূরে আলাদা লাইনে দেওয়া হবে। আমি তো ভেবেছিলাম, তোরা আমার নিজের লোক, সারাদিন থাকবি, আনন্দ করে খাবি, কাজকামও কিছু করবি। এই কটা লোক নিয়ে এত বড় একটা মহচ্ছব আমাকে একাই উদ্ধার করতে হছে। তুই আর শুখরাম, তোরা সব হলি গিয়ে বিজ্ঞ মানুষ, তা আমার পাশে থাকলে বুকে কত বল পেতাম। কপাল।

—তা কী করব বাবু, হামাদের থোড়া অসুবিধা ছিল। হাঁ বাবু, বসে না-খেলে হামাদের খানা দিবেন না ?

নন্দকিশোর খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠলেন, বললেন, রামো, রামো, আরে পাগলা, আমি কী তা বলেছি ? তুই যত্ত খুশী মায়ের ভোগ লিয়ে যা না ক্যানে। কিন্তু রেতের বেলা তো তোকে গঙ্গার ওপারে যেতে হবে। তখুন তোর মেয়ে, শুখরাম, রূপচাঁদ এরা তো খেতে আসবে ? তোর মেয়ে যদি আসে তো ভাল, না হলে তার খাবার ব্যবস্থা আমি নিজেই করব। তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললেন, রাত-কালে তুই ওপার থেকে না-ফেরা অব্দি মন্দিরে বাবাঠাকুরের জিম্মায় তোর মেয়েকে রেখে যেতে পারিস। আমি তো সারারাত থাকব না, বাড়ি যাব। তা বাবাঠাকুর আখুন হোমে বসেছেন, সাঁঝের বেলায় ধ্যানে থাকবেন, ইয়ার ফাঁকে একবার জেনে লিব। তবে বাবার কাছে জাত-বেজাত নাই। কিন্তু সোমত্ত মেয়ে, তিনি জিম্মায় রাখতে রাজী হবেন কি না! যা হোক জেনে লিব! খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে আমার বাড়ি ফিরতে রাত বারোটা তো হবেই। ততক্ষণ ভাবনা নাই, আমি তো আছি। কিন্তু নিশিরাতে তোর মেয়ে যদি বাবাঠাকুরের জিম্মায় থাকে তো—

পদম বলল, না বাবু, টগর ঘরেই থাকবে। রাতের খাবার পঁহুছ দিয়ে তব্ হামি ওপারে যেতে পারব। আর রূপচাঁদ তো ঘরে নাই, দোস্ত শুখরাম খেতে আসবে কি না হামি একবার পুছে দেখব। হামাদের জন্যে আপনাকে অত ভাবতে হবে না বাবু। হামরা মুর্দাফরাশ, ডোম-চণ্ডাল, হামাদের লিয়ে কে ভাবে ?

—তা বললে কি হয়রে ? তোরাই তো আমার আপনজন, আর তো সব ফালতু। যাই হোক, তবে তাই হবে! সব কথা জেনে রাখা ভাল, আমার তো একটা দায়িত্ব আছে। আমি যখুন তোকে কাজের জন্যেই ওপারে পাঠাছি, তখুন তোর ভাল-মন্দ আমাকে দেখতে হবে না ? তারপর একটু থেমে বললেন, হ্যাঁরে পদম, তোর মেয়ে তো বেশ সোমত্ত হয়েছে। অমাবস্যার নিশিরাতে একা ঘরে থাকবে ? কিছু ঘটলে আমাকে দুষিসনা বাপু।

পদম হাসল, বলল, বাবু, হামরা বনজঙ্গলের জংলী জীব, ডোম চণ্ডালের লেড়কীর অত ভয় ডর থাকলে কি চলে ? আপনাকে দোষ দিব ক্যানে ? লেকিন দিনকাল তো খারাপ হয়ে যেছে, তো হামাদের যাতে কুনো বিপদ না-হয় সেদিকে থোড়া নজর রাখবেন বাবু। আপনার কাছে হামার শুধু এইটুকু আর্জি আছে।

—ঠিক আছে, তোরা নির্ভয়ে থাকনা ক্যানে। বিপদের দিনে শুধু হাঁক দিস, আমরা তো মানুষের বিপদ-আপদে পাশে আছি। ঠিক আছে। তুই তাহলে অন্নের ভোগ লিয়ে যাস, আমি উ দিকটা আখুন একটুকুন তদ্বির-তদারক করি গা—

নন্দকিশোর ব্যস্তভাবে কাজকর্মের তদারক করার জন্য এগিয়ে গেলেন।

নন্দকিশোর সরকাব একটু বেশী কথা বলেন। কথা বললে আর থামতে চান না, যেন খৈ ফোটে ! এক সঙ্গে অনেক কথা বলেন ও প্রশ্ন করেন, আবার নিজে নিজেই উত্তর দেন। পদম তা জানে বলেই চুপ করে শোনে। যথাসম্ভব কম কথায় জবাব দেয়। নন্দকিশোর কী ধাতের মানুষ তা কিছুটা বুঝেছে পদম। নন্দকিশোর বেশী কথা বললেও বাজে কথা বলেন না। নিজের স্বার্থ ও লক্ষ্য স্থির রেখেই কথা বলেন। তবে কথার মারপ্যাঁচে কতটা সূক্ষ্ম বুদ্ধি তার ভেতরে কাজ করে তা পদমের মাথায় ঢোকে না।

চারপাশে হৈচৈ, পূজোর ধুমধাম। নন্দকিশোরের লোকজন ছোটা-ছুটি করছে। কাজকর্মের জন্য কিছু উট্‌কো ভক্তের দলও জুটে গেছে। বহু পুণ্যার্থী মানুষের সমাগম হয়েছে। ভোর থেকে মানুষের ভিড় বাড়ছে। দুপুর নাগাদ পংক্তি ভোজ শুরু হয়ে চলল বিকেল পর্যন্ত।

পদম অন্নের ভোগ নিয়ে ঘরে ফিরে এল। ঘরে এসে ওরা তিন-জনে মিলে একসঙ্গে বসে আরাম করে খানাপিনা সারল। ঠিক হল রাতের খাবার শুখরাম নিয়ে আসবে। শুখরাম টগরের জন্যে রাতে খাবার দিয়ে যাবে আর ওদের বাপ-বেটার খাবার সে নিজের ঘরে রেখে আসবে। রূপচাঁদ ফিরে এসে খায় তো ভাল, নচেৎ শুখরাম রাতে

ফিরে এসে খেয়েদেয়ে নিজের ঘরেই থাকবে। রাতে ঘরে পাহারা না-থাকলে তো চুরি-ডাকাতিও হতে পারে। তবে সন্ধ্যে বেলায় রূপচাঁদ ফিরে এলে তবেই সে শহরে যাবে। আর রাতে পদম ফিরলে তখন রূপচাঁদ ছুটি নিয়ে ঘরে ফিরতে পারবে। কারণ অমাবস্যার নিশিরাতের খারাপ হাওয়া-বাতাস সোমত্ত মেয়ে টগরের গায়ে লাগলে এবং সে ডর পেলে খুব মুস্কিল হবে। তাছাড়া এই নিশিরাতে অপদেবতাদের উৎপাত বাড়ে। কুমারী রজস্বলা মেয়ে হলে তো আর অপদেবতাদের হাত থেকে রেহাই নাই। এমন কত ঘটনা ঘটতে দেখেছে ওরা। এদিকে তো মেয়েও একলা ঘরে থাকতে ভীষণ ভয় পাচ্ছে। এমন অবস্থায় কোনরকম হটকারিতা করার কোন মানে হয়না।

শুখরাম বলল, এ পদম ভাইয়া, তুমহার ফিরতে ধরো যদি রাত কাবার হয়ে যায় তো তামাম রাত হামার লেড়কাঠো ভুখা থাকবে। তো হামি বলি কি ওর খানা তুমহারী বেটির কাছে বিলকুল মজুত রাখ্ দো। উ বেটা বদমাসটা তো রাতে ভুখ মিটাতে পারবে। ঠিক হ্যায় না?

—ইয়ে তো একদম ঠিক বাত হ্যায় দোস্ত। আউর রূপচাঁদ ফিরলে তুমহার দায়িত্ব খালাস হয়ে যাবে। তখুন তুমহি আপনা খুশীসে শহরমে ঘুরে সওদা করে ঘরে ফিরতে পারবা।

সেই কথামত সন্ধ্যেরাতে শুখরাম রাতের খাবার নিয়ে ঘরে ফিরে এলে পদম চলে গেল। কিন্তু তখনও রূপচাঁদের পাত্তা নাই। রূপচাঁদ ফিরল সন্ধ্যা উতরে যাবার অনেকক্ষণ পর।

শুখরাম লেড়কার অনুপস্থিতিতে যতটা তেজ দেখায়, বেটা সামনে এলে ঠিক তার বিপরীত ব্যাপার ঘটে। সে তখন একটু নরম হয়ে তোয়াজের সুরে কথা বলে। এখনও সে ব্যাপারে কোন ব্যতিক্রম ঘটলনা। শুখরাম বলল, লে বেটা, এঁহা পর তু সিপাহী বন্‌কে পাহারা দে। মেরা মালুম হ্যায় কি পদম রাতমে ঘুমকে আ যায়েগা। যব্‌তক্ পদম না-আসে তু ইধর-উধর যাস না। বেটির বড় ডর লাগে। উসকী একেলি ঘরমে ছোড়্‌কে বাহার যানা ঠিক নহী হ্যায়। হামি তো সারাদিন পাহারা আছি। আথুন তোর জিম্মায় থাকল। লেকিন

ধরম মেনে চলিস্। হামি আখুন বাজারে যাব, কুছু সওদা করে ফিরব। পদম ফিরে এলে তু ছুট্টি লিয়ে ঘরে ফিরে আসিস্। ভুখ লাগলে আপ্না খুশীসে খানা খেয়ে লিস্। ম্যাঁয় চল্ রহা হু।

শুখরাম চলে গেলে রূপচাঁদ ঘরের মেঝেতে বিছানো শীতলপাটির ওপর পা ছড়িয়ে বসে পড়ে বলল, হামার বাপ তো খুব ছটফটে আদমি, তো সারাদিন এক ঠাঁয়মে ক্যায়সে ছিল টগর?

টগর হাসল, বলল, তুম কুথাকে গিয়েছিলা রূপচাঁদ? কেয়া কাম ছিল বা!

রূপচাঁদ টগরের কথার জবাব না-দিয়ে বলল, তুমহার বাপ কাঁহা গেলেন?

—কৌন্ মালুম। শুনেছিলাম তো গঙ্গার ওপারে কালীমায়ীর পেসাদ লিয়ে যেতে হবে। হামি আউর কুছু জানিনা।

—ও হো! কালীমায়ীর পূজাকী পেসাদ! হামার একদম খেয়াল ছিল না। তো খুব ধুমধাম আউর ঘটা করে পূজাটুজা হল বুঝিবা!

—হাঁ, বহুত আদমি পেসাদ খেয়ে গিয়েছে। আচ্ছা রূপচাঁদ, মায়ীকী পেসাদ খেলে কী দোষ আছে?

রূপচাঁদ হাসল, বলল, হামি কী দোষের কথা কুছু বলেছি? উখানে তুমহাকে যেতে ক্যানে বারণ করেছিলাম তা সমঝাতে পারোনি? তুমহি উখানে গিয়েছিলা নাকি?

—না, হামি যাই নি। তুমহার বাত হামি সমঝ গিয়েছিলাম। উবেলা হামার বাপ গিয়ে ভোগ লিয়ে এসেছিল, হামলোগ সব ঘরে বসে খানা খেয়ে লিয়েছি। ই বেলাতে শামকো থোড়া আগে তুমহার বাপ গিয়েছিল, এত্তা খাবার লিয়ে এসেছে। হামার মুনে হছে তুমহার খুব ভুখ লেগেছে! তো বহুত খানা মজুত আছে, আখুন খাবেক নাকি?

—হাঁ, ক্যানে খাবো না? খাবারে কী দোষ আছে? সচ্ বাত, হামার খুব ভুখ লেগেছে।

দুপুরের অন্নের ভোগ, রাত্রের লুচি, মোহন ভোগ, আলুর দম সব-রকম খাবার থরে থরে সাজিয়ে রূপচাঁদের সামনে নিয়ে এল টগর।

রূপচাঁদ তো এত খাবার দেখেই হতবাক, বলল, আই বাপ! এ যে ইলাহী কারবার!

—তুমহার লেগে সব মজুত রেখেছি। হামার তো খেয়াল আছে কি তুমহি শুখাভুখা ফিরবা। সারা দিনমান তো খানাপিনা জোটে নাই বুঝিবা! কুথাকে গিয়েছিলা আভিতক তো বোলো নাই। সচ্ বোলো রূপচাঁদ, কাঁহাসে আ রহে হো তুম?

—কাম ছিল টগর, লেকিন এত্তো খানা তো হামি খেতে পারবনা।

—যা পারবা খাওনা ক্যানে, আরামসে খাও। তুমহার লেগেই যুগাল দিয়ে রেখেছি।

—তুম নহী খাওগী টগর?

—হামি তো আগে খেয়ে লিয়েছি।

—আভি থোড়া খাও। হামি তো এত্তো খানা খেতে পারব না।

—তুমহার খানেকা বাদ যো কুছ্ থাকবে, হামি পরে খেয়ে লিব। আখুন হামার ভুখ নাই।

রূপচাঁদ গোগ্রাসে খেতে থাকল। টগর পাশে বসে মিটি মিটি হাসতে হাসতে রূপচাঁদের খাওয়ার তদারক করতে লাগল।

টগর বলল, আহা রে! বড়া ভুখ লেগেছিল তুমহার রূপচাঁদ। তামাম দিনমান পেটে কুছু দানাপানি পড়েনি বুঝিবা!

রূপচাঁদ বলল, উবেলা থোড়া রোটী আউর গোস্ত জুটেছিল, লেকিন দিনমান বড়া খাটুনি গিয়েছে, ভুখ তো লাগবেই। একঠো বাত হামি ভাবছি কি উ শালাদের এত্তো মালকড়ি রুপিয়া কাঁহাসে মিলছে। হামি জানে সাধু আউর সরকার দো-নম্বরী কারবার জুড়েছে। হামার কাছে আসলি রিপোর্ট আছে। তো এত্তো মাল কামাছে কাঁহাসে? বড়া তাজ্জব কী কহানী হ্যায় টগর!

—অ্যাঁ! ইয়ে কেয়া বাত? কেয়া বোল রহে হো তুম? সাধুবাবা, সরকারবাবু, দো-নম্বরী কাম!

—হামি ঠিক বাত বলছি টগর. তুমহি মিলাকে দেখে লিয়ো। তুমহার বাপ্ বড়া ভুল কাম করে ফেলেছে। উসব কালীমায়ীকী পেসাদ

নহী হ্যায়। হামি আন্দাজ করছি কি তুমহার বাপের জিম্মায় গঙ্গার ওপারে শালা শুয়োরের বাচ্চা সাধু আউর সরকার বাবার পেসাদ চালান দিছে। বুড্ঢা আদমি, যেতে বারণ করলাম, তো না-শুনলে হামি আউর কী বলতে পাবে?

—ইসব কী বলছ তুমহি রূপচাঁদ? বাবার পেসাদ। ইয়ে কোন চীজ হ্যায়?

রূপচাঁদ হাসল, বলল, গাঁজা হাসিশ্, হেরোইন। বুঝলা কুছু? তুমহার বাপ তো বুড্ঢা আদমি, আঁখো কী নজর কমতি হো গয়ী হ্যায়। এইসব ব্যাপার, এই দিনকাল বুঝবে কী করে!

—বড়া তাজ্জব কী বাত! এত্তো খবর তুমহি কাঁহাসে জানতে পারলা বা?

—হামার তো একই রকম দো-নম্বরী লাইন আছে না! লাইনের খবর ঠিক চলে আসে। তবে হামার কারবার দুসরা চীজ্ লিয়ে। উসমে খারাপ কুছু নাই।

টগর আতংকে চোখ বড় বড় করে তাকাল রূপচাঁদের দিকে, তারপর বলল, তুমহি কৌন্ চীজ লিয়ে কারবার করো রূপচাঁদ? নোকরি ছাড়লা ক্যানে, হামাকে তো কুছু বল নাই?

—হামার সিধা কারবার। ফরেন ছাতা, পেন, টেরিলিন, টেপ-রেকডার। কভি কভি তামা সোনা চাঁদি। হরেক কিসিমের মাল। বডার থেকে লিয়ে আসছি, নানান্ মুলুকের খরিদ্দার কিনে লিয়ে যেছে। ইসমে জাদা লাভ। নোকরি সে কেয়া হোগা?

—এইসা কাম কিঁউ করতা হ্যায় রূপচাঁদ?

—হামি রহিস আদমিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রুপিয়া কামাতে চাই। টাকা হলে দেখে লিয়ো কেহু আর হামাদের মুর্দাফরাশ বলে ঘিন্না করবে না, তখুন বহু আদমি সেলাম করবে।

—ভুল রূপচাঁদ, ভুল। তুমহি যা আছো, তাই থাকবা। তুমহি জাত-ধরম মুছে ফেলতে পারবা না। ইয়ে মত্লব ছোড় দো রূপচাঁদ। বেশী বড় হতে যেয়ো না। বেশী বাড়াবাড়ি হলে রহিস আদমিরা

তুমহাকে পুলিশে ধরিয়ে দিবে, হাজতে চালান দিবে। খুব সাবধান রূপচাঁদ ?

—কে কাকে ধরবে ? তলা থেকে ওপর সব লাইন করা আছে। ডোম-চণ্ডাল, বামুন-ভদ্দরলোক সরকারী-বেসরকারী সবাই একই ঘাটে পানি আউর একই হুঁকাতে তামুক খায়। পুরা চেনে বাঁধা। তলায় হামলা হলে ওপর মহলের আউর রহিস আদমিদের বহুত কিস্‌সা ফাঁস হয়ে যাবে। হামি তো লাইন বুঝে গিয়েছি। আউর গাঁজা হাসিশের বেলায় ওপর মহলের খার বেশী, কড়াকড়ি বেশী। উ লাইনটা হামার জানা নাই। তবে হামার জানতে টাইম লাগবে না। লেকিন উ লাইনে হামি আভিতক যাইনি, কখুনো যাব না। উটা বহুত খারাপ লাইন আছে, দেশ-তুনিয়াকে জাহান্নামে লিয়ে যেছে।

—তুমহার লাইন বুঝি বহুত সাচ্চা আছে ? সব ঝুটমুট কারবার !

—হামার পিছে কত রহিস মুরুব্বি আছে জানো ? উরা সব দেশের মানীগুণী আদমি। তাদের বেকার লেড়কারা হামার দলে আছে। উরাই তো হামাকে লাইনে লিয়ে এসেছে।

—সব ঠিক হ্যায়, লেকিন উরা তুমহাকে দিয়ে কাম করিয়ে লিবে, জিয়াদা মুনাফা লুটবে, কাম ফুরালে কি কুছু গড়বড় হলে উরা তুমহাকে খতম করে দিবে। আভিতক সমঝাতে পারো নি ?

—জরুর। হামি তো উস লিয়ে তুসরা বেওসাকা লাইন ঠিক মতলব করে রেখেছি। হামার শাকরিদ্‌রা সবাই রাজী আছে। ই লাইনে লালবাতি জ্বলে উঠলে হামরা তুসরা লাইনে ঝাঁপ মারব। তুমহার কুছু ভাবনা নাই। আখুন সব বেওসামে দো-নম্বরী লাইন আছে। শুনলে তাজ্জব বনে যাবা কি রহিস আদমিরা উসমে মদত দিছে। আখুন দিনকাল এইসা হয়েছে কি সাচ্চা লাইনে গেলে জিন্দেগীমে বারো বেজে যাবে। তবে হাঁ, সাচ্চা লাইনের কিম্মৎ আলাদা। ঝুটা লাইনের কারদানি তো দো দিনকে লিয়ে।

টগর তু'হাত জোড় করে মা কালীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করে বলল, হে কালীমায়ী, হামার বাপকো ভালাই করো, ঠিকসে ঘরমে পঁহুছ

দিয়ো হে মায়ী। হামি তুমহার পাঁও পর পূজা দিবো, দুয়ারে ধর্না দিব।

রূপচাঁদ হাসল, বলল, ভয়ের কুছু নাই। তুমহার বাপ নয়া আদমি, উনকো যখুন পাঠিয়েছে, তখুন জরুর খুব ভালমতুন লাইন করে লিয়েছে। তা না হলে তো সাধু আউর সরকার দো আদমি শ্রেফ ধরা পড়ে যাবে। তা তো হতে দিবে না। তবু ই লাইনে ভরসা কম, ভয় বেশী। তবে ভয় নাই, লাইন না থাকলে উন্‌কো পাঠাত না।

রূপচাঁদ খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ে। এক লোটা জল নিয়ে বাইরে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে ফের ঘরে ফিরে আসে।

টগর ইতিমধ্যে ফের মা কালীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করে প্রার্থনা জানায়ঃ রূপচাঁদকে ই লাইন থেকে সাচ্চা লাইন পাইয়ে দিও মায়ী, দুসরা কাম পাইয়ে দিও মায়ী, হামি তুমহাকে পূজা দিব। ম্যাঁয় গরিব কাঙাল লেড়কী! হে মায়ী, তুমহার কাঙাল লেড়কীর দিকে থোড়া মুখ তুলে তাকাও।

রূপচাঁদ বলল, পূজা তো দিবে বলেছ, তো বারবার না-বললে কি কালীমায়ী বিশোয়াস যাবেন না, ঝুট বাত ভাববেন? পূজা দিবে বলে কেহু কালীমায়ীকে টোপি পরায় না, মায়ী তা জানেন।

টগর বলল, চুপ যা, বদমায়েস কোথাকার! তারপর রূপচাঁদের দিকে তাকিয়ে সে বলল, তুমহার পাঁয়ে পড়ি রূপচাঁদ, ই লাইন তুম ছোড়্ দো, দুসরা লাইন ধরো। পুলিশ হাজত হাঙ্গামা হামার বহুত ডর লাগে। হামার ই লাইন পসন্দ নয। হামি শান্তিসে ঘর গেরস্তালি করতে চাহি।

রূপচাঁদ একটু এগিয়ে গিয়ে টগরকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, রাম, রাম, ইসব বাত বলবে না টগর, তুমহি সতী লেড়কী, ফালতু পাঁও ছুঁবার বাত বললে হামার গুনাহ হবে। তারপর ডান হাতে আল্‌তো করে টগরের থুতনিটা তুলে ধরে সে বলল, হামি তুমহাকে আজ কালীমায়ীর নামে কসম করে বলছি টগর, শাদীকে বাদ হামি ই লাইন ছোড়্‌কে দুসরা বেওসা জুঁড়েগা, দো কামরাকা ছাপরা

বানায়েগা। একঠোমে দো বুড্ঢা বাপ, আউর তুসরেমে ম্যাঁয় আউর তুম।

—সচ্ বাত বোল্‌তা হ্যায় তো ?

—জরুর! রূপচাঁদ টগরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, কেমুন হবে বলো ? তখুন তুমহার জন্যে ঘরমে কালীমায়ীকী পূজার সব বন্দোবস্ত করে দিব। আউর কটা দিন গেলে হামি ভাল রুপিয়া জমাতে পারব, তখুন বেওসা করার মতুন হাতমে পুঁজি এসে যাবে, ঘরভি বানানো হয়ে যাবে। তখুন আস্তে আস্তে ই লাইনটাকে হামরা ব্যাক-ডোরে ঠেলে দিতে পারব। ঘাবড়াও মাৎ!

—আখুন ছেড়ে দাওনা ক্যানে ? ইসব কাম জলদি করা ভাল।

—না ভাল না। আখুন একদিনে ঝপাৎ করে লাইন থেকে সরে গেলে খুব মুস্কিল হবে, লাইনের আদমিরা, লাগোয়া দল, মাল খানেওয়ালা পার্টি, খোঁচর, দালাল সব আদমি চটে যাবে, হামাকে ঠিক পাকড়াও করে খতম করে দিবে। হামি ঠিক ম্যানেজ ক'রে চলব দেখে লিয়ো।

টগর রূপচাঁদের বুকের ওপর মাথা রেখে বলল, তুমহি সচ্ বাত বলছো তো ?

—জরুর। হামি পহেলা নম্বর বদমায়েস হতে পারি, লেকিন ঝুটা বাত হামি কভি বলি না।

হঠাৎ বাইরে কিসের একটা শব্দ শোনা গেল। রূপচাঁদ তটস্থ হয়ে সরে দাঁড়াল। ঘরের দরজা খোলা। এককোণে টিমটিম করে বাতি জ্বলছে। রূপচাঁদ ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। সে প্যান্টের হিপ্-পকেট থেকে একগোছা টাকা বার ক'রে টগরের হাতে দিয়ে বলল, এটা লুকিয়ে রাখ। আউর তুমহি ঝটপট খেয়ে লাও। আজ রাত খুব ভাল নয়, কুছু খারাপ ঘটে যেতে পারে।

টগর টাকাগুলো লুকিয়ে রেখে রূপচাঁদের পাতের অভুক্ত খাবার খেতে বসল। রূপচাঁদ প্যান্টের সামনের পকেট থেকে একটা ছোট টর্চ, হিপ-পকেট থেকে ছুরি আর আণ্ডারপ্যান্টের পকেট থেকে পিস্তল বার

করে সব হাতের কাছে গুছিয়ে রাখল। টগর তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে ঘরের ভেতরেই হাত মুখ ধুয়ে নিল। তারপর সে রূপচাঁদের পাশে এসে বসে পড়ল এবং অবাক হয়ে অস্ত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। কারও মুখে কোন রা নাই। টগর ভয়ে জড়সড় হয়ে রূপচাঁদের গা ঘেঁসে বসল। রূপচাঁদ বাঁ হাত দিয়ে টগরকে প্রায় বুকের কাছে টেনে নিয়ে এল।

টগর ফিস ফিস করে বলল, হামার বড ডব লাগছে রূপচাঁদ।

—ডরো মাৎ! শব্দটা কিসের হল? কুছু বুঝতে পারছি না। দুষমন কৌন হ্যায়? উসকা মতলব কেয়া হ্যায়?

রূপচাঁদ টগরকে সরিয়ে দিয়ে ঘরের ছোট জানালাটা খুলে বাইরের দিকে তাকাল। শনিবার। অমাবস্যার ঘন কালো রাত। বাইরে বনঝোপের ভেতর দিয়ে কিছুই নজরে যায় না। টগর দৌড়ে এসে ঝপ্ করে জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, ইস-স, খুলো মাৎ!

রূপচাঁদ বলল, শিয়াল কুকুর হতে পারে। ভয় কী?

—না। শনিবার, অমাবস্যার রাত! কত হাওয়-বাতাস দত্যি-দানো ঘুরে বেড়ায়···

রূপচাঁদ এবার হেসে ফেলল, টগরকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল। চুমোয় চুমোয় টগর বিবশ হয়ে পড়ল। ওর শাড়ি খুলে গেল, খোঁপা খুলে গেল, ব্লাউজের বোতাম আলগা হয়ে খুলে পড়ল। রূপচাঁদ টগরকে জড়িয়ে ধরে শীতলপাটির ওপর শুয়ে পড়ল। দু'জনেরই শরীর গরম হয়ে উঠল। ঘন ঘন উভয়েরই শ্বাস-প্রশ্বাস পড়তে লাগল। টগর এবার রূপচাঁদকে বাধা দিল।

—আর না রূপচাঁদ, আর না। টগর রূপচাঁদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

রূপচাঁদও নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে বসল। টগরের সর্ব দেহের অপূর্ব নগ্ন সৌন্দর্য দেখে রূপচাঁদ মুগ্ধ হয়ে গেছে। টগর ঝটপট উঠে শাড়ি ব্লাউজ ঠিকঠাক ক'রে পরে নিল, চুল এলোখোঁপা করে বাঁধল।

তারপর রূপচাঁদের পাশে বসে পড়ল। কিন্তু এ কী আশ্চর্য! রূপচাঁদ চোখ বন্ধ করে বসে আছে।

টগর বলল, কী হল রূপচাঁদ, তুমহার গুস্‌সা হল না কি?

রূপচাঁদ চোখ খুলে হাসল, বলল, নহী, গুস্‌সা কাহে হোগা? ম্যাঁয় আপনা আঁখোমে দেখা কি তুম কিত্‌নে সোন্দর··· রূপচাঁদ ফের হাসল, বলল, আঁখি বন্ধ করে হামি সেই সোন্দরের স্বপ্ন দেখছিলাম টগর।

টগব রোষ-মেশানো চোখে রূপচাঁদের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল, রূপচাঁদের গালে আঙুলের টোকা মেরে বলল, তুম বহুত বদমাশ হো গয়া রূপচাঁদ। তারপর মাথা নিচু করে বলল, আগে শাদী হোক, তব্ তো—

—ইয়ে তো ঠিক বাত হ্যায়। লেকিন মন-মর্জিকা মিল আসলি শাদী হ্যায় না? উও তো হো গয়া। আভি তো লোক-দেখানি কাম বাকি হ্যায়।

—আচ্ছা রূপচাঁদ, একঠো বাত পুছবো? সেদিন তুমহার ঘরে ঢুকে দরওয়াজা বন্ধ করে হামি কী এমুন অন্যায় করেছি বলবা?

—কুছু না। তো সে অন্যায় হামি আজও করেছি, আখুনও। ইখানে সিধা রাস্তেমে গেলে তো বিপদ ঘটতে পারে, জান লিয়ে টানাটানি হতে পারে। হামি কুছু অন্যায় করিনি, তুম ভি নহী।

—লেকিন, তারপর যা সেদিন ঘটেছিল, আজ যা ঘটল? আখুনো তো শাদী হয় নাই।

—ধেত্তেরি! উঁচা জাতের ভদ্দরবাবুদের কিস্‌সা-কহানী শুনলে তো তুমহি কানে আঙুল দিবা। হামার তো সব অলিগলি ঘুরা আছে। উরাই ই সমাজে খাতির পায়। তো ইসব বাত কে বলেছে তুমহাকে? বাপেরা বলেছে তো? উরা পুরানাকালের বুড্ঢা আদমি, খারাপ লাগতে পারে। লেকিন হামরা তো বডার, চেক্-পোষ্ট ক্রশ করি নি।

—তার মানে? তুমহার কথা হামি বুঝতে পারি না, খুলে বলো না ক্যানে।

রূপচাঁদ হাসল, বলল চুপ্! তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, ফের একঠো আওয়াজ হল না?

টগরের চোখে মুখে তখনও একটা ভালো-লাগার রেশ লেগে রয়েছে! সে স্থির মুগ্ধ দৃষ্টিতে রূপচাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সে বলল, আজ হামার দিল খুশীমে ভরপুর হয়ে গিয়েছে, এত্তো আরাম হামি জিন্দেগীমে কভি ভুলতে পারব না। রূপচাঁদ, তুমহি কত্তো সোন্দর, হামি তা আজ বুঝতে পেরেছি।

রূপচাঁদ টগরের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, একঠো আওয়াজ শুনতে পাওনি?

—নহী রূপচাঁদ, হামার কানে কুছু ঢুকেনি। হামার সারা তবিয়তে, দিলমে শুধু আনন্দ, শুধু খুশীকি আওয়াজ ঘুরছে। হামাকে ফির জিয়াদা আবাম দিবে রূপচাঁদ?

রূপচাঁদ ফের টগরের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, চুপ করো টগর, ছেলেমানুষী করো না।

টগর একদৃষ্টিতে রূপচাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, বেশ করব, হামার খুশী। হামি ন্যায়-অন্যায় বুঝি না। তুমহাকে হামার পতি মেনেছি। তো তুমহার কাছে সুখ চেহে হামি কী অন্যায় করেছি?

—ইস্স্! টগর, চুপ করো। কান পেতে শুনো বাহারমে দুষমন ঘুরাফিরা করছে।

এতক্ষণ পর টগরের কানে দূর থেকে ভেসে-আসা একটা শব্দ ঢুকল। টগর বলল, তুম ক্যায়সে সমঝা? কেয়া মতলব শয়তান কা?

—মেরা মালুম হ্যায় কি উ শালারা সরকারের লোক আছে, খুব খারাপ মতলব লিয়ে এসেছে।

এবার শব্দটা বেশ জোরে ঘরের আশেপাশেই শোনা গেল। পায়ের ধুপধাপ শব্দ। ফিসফিস সলাপরামর্শের শব্দ। বর্ডারে চোরাই মালের কারবারী রূপচাঁদ। তার কান চোখ পঞ্চ ইন্দ্রিয় যেমন তীক্ষ্ণ, সাহসও তেমনি দুর্ধর্ষ। খুন জখম, ঝোপজঙ্গল, জন্তু-জানোয়ার এসবের

ভয়ডর তার ধাতে নাই। সে মুহূর্তের মধ্যে খাড়া হয়ে দাঁড়ায়। কী এক অসীম শক্তি যেন তাকে ভর করে। এক হাতে পিস্তল আর অন্য হাতে টর্চ তুলে নেয়। টগরের হাতেও ছুরিটা তুলে দেয়।

এবার টগরের কানে শব্দটা ভালমতই ঢুকেছে। সে বলল, হামি ছুরি ধরতে পারব

রূপচাঁদ বলল, হামার বহুড়ি হতে গেলে ছুরি চালানো শিখতে হবে।

টগব গাছকোমর করে শাড়িটা জড়িয়ে নিয়ে ছুরিটা নরম হাতে বেশ শক্ত করেই ধরবার চেষ্টা করল। রূপচাঁদ পরমুহূর্তেই দরজার খিল খুলে বাইরে লাফ দিয়ে নামল। চারপাশে টর্চের আলো ফেলতেই দেখা গেল হুলো আর ঢ্যাং ঊর্ধশ্বাসে শ্মশানের দিকে ছুটছে।

রূপচাদ বাজর্খাই গলায় চীৎকার করে উঠল : আবে এ হারামী লোগ, শালা শুয়াবকা বাচ্চা, মর্দানা হো তো ফির ইধর আ যা, বকরিকা মাফিক একদম জবাই কর্ তুঙ্গা। রাগে গরগর করতে করতে সে দাঁতে দাঁত চেপে পিস্তল থেকে একটা গুলি করেই বসল।

গুলির শব্দে সমগ্র বনভূমি, সমস্ত কীট পতঙ্গ, বন্যপ্রাণী চমকে ওঠে। দিক থেকে দিগন্তে সে শব্দ ছড়িয়ে পড়ে। রাতের অন্ধকার, স্তব্ধতা খানখান হয়ে ভেঙে যায়। ঘুম ভাঙে শুখরামের। সে ছুটে আসে পদমের ঘরের দিকে। দূরে মেথর পাড়া। গুলির শব্দে সেখানেও অনেকের ঘুম ভাঙে। কিন্তু কেউ আর এগিয়ে আসতে সাহস পায় না। আরও বহুদূরে বামুন কায়েত ভদ্রপাড়া। সেখানেও কেউ কেউ জেগে যায়। কিন্তু আজকাল তো হামেশা চারপাশে বোমা পিস্তলের গুলির শব্দ কানে আসে। ফলে কে আর অত কান খাড়া করে ঘটনা শোনার আগ্রহ নিয়ে জেগে থাকে। তাই তারা জেগেই ফের ঘুমিয়ে পড়ে।

শুধু শুখরাম আসে। সব কথা শুনে সে অবাক হয়ে যায়। সরকারের আদমিরা চুরি করতে এসেছিল! এটা তো তাজ্জবের কথা! ওদিকে শুখরামও ঘর খোলা রেখে এসেছে। ঘরে তো কিছু টাকার

মালপত্র আছে। সুতরাং শুখরামকে এক্ষুনি ঘরে ফিরে যেতেই হবে ; ঘরে কেউ না-থাকলে চোখের নিমিষে চুরি হয়ে যেতে কতক্ষণ !

শুখরাম বলল, ইয়ে তো বহুত মুস্কিলকী বাত। দেখ্ বেটা খুব আচ্ছা করকে দরওয়াজা বন্ধ ক'রে তুরা শুয়ে বসে থাক। লেকিন সাবধানে থাকিস। পদম ভাইয়া যব তক্ ফিরে না আসছে তভ্ক্ষণ কেহু বাহারমে যাস না। দিনকাল বহুত খারাপ, পিছে দুষমন লেগেছে। হামি ঘরে যাই। দরকার হলে একঠো হাঁক দিয়ে হামাকে ডাকিস্। যা তুরা দু'জনা ঘরমে চলা যা।

শুখরাম চলে গেল। রূপচাঁদ দেখল ওর বাপ এখন ঠেলায় পড়ে সোমত্ত লেড়কা লেড়কীকে ঘরে খিল এঁটে থাকবার উপদেশ দিয়ে গেল। ফলে ওদের দুজনের মাঝখানে যেটুকু নিষেধের প্রাচীর এতক্ষণ খাড়া হয়ে ছিল, এখন তা আর রইল না। শুখরাম নিজের হাতেই তা ধসিয়ে দিয়ে গেল।

রূপচাঁদ জানে ওরা চাল ডাল চুরি করতে আসে নি। যতদূর মনে হয় ওরা এসেছিল টগরকে তুলে নিয়ে যাবার জন্য। টগর সুন্দরী যুবতী। এবং এর পিছনে সাধু আর সরকার দু'জনেই আছে। ওর বুড়ো বাপ এসব কিছুই বুঝতে পারে নি। ভেবেছে মামুলী চোর এসেছিল বাটি-লোটা চুরি করার জন্য।

কিন্তু একটা জিনিস এখনও রূপচাঁদের মগজে ঢোকে নি যে সাধু বা সরকার কে এবং কী উদ্দেশ্যে টগরকে ব্যবহার করতে চায় ! সেটা আগে জানতে হবে। তারপর যা করার সে করবে। কত বড় হিম্মত ! রূপচাঁদ এ-তল্লাটের জওয়ান মর্দানা, সে জিন্দা থাকতে তারই পেয়ারীকে শালারা লোপাট করতে চায় ! রূপচাঁদ সবকে ঝাড়ে মূলে একদম খতম করে দিবে, একেবারে নির্বংশ করে ছাড়বে।

তবে এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে গুলিটা কোন একজনের পায়ে ঠিক লেগেছে। কিন্তু কে সে তা রূপচাঁদ ঠিক বুঝতে পারেনি।

রূপচাঁদ টগরকে বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরে ঘরে ঢুকে বাপের কথামত বেশ জোরেই খিল এঁটে দিল। তারপর অস্ত্রগুলো একপাশে সরিয়ে

রেখে উত্তেজিত মেজাজটা শান্ত করার জন্য রূপচাঁদ টগরকে ছ'হাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বারবার চুমো খেতে লাগল। এই প্রচণ্ড আলোড়নে টগরের শাড়ি ব্লাউজ এবার সম্পূর্ণ এলোমেলো হয়ে খুলে পড়ল, এলো খোঁপা আলুথালু হয়ে খুলে পড়ায় সারা দেহে চুলের ঢল নামল। এবার টগর রূপচাঁদকে আর কোন বাধা দিল না। ওরা ছ'জনে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে মেঝেয় পাতা শীতলপাটির ওপর শুয়ে পড়ল। একপাশে ওদের পোশাক-আশাক স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে রইল।

এখন ওরা যেন কোন আদিম যুগের মানব-মানবী কিংবা পারমিসিভ্ সমাজের নায়ক-নায়িকা। সেইরকম ভাবভঙ্গি নিয়ে ওরা ছ'জনে অমৃতমধুর চুম্বনে, আলিঙ্গনে ও দেহের উত্তাপ দিয়ে একে অপরকে বারবার পরখ করে দেখতে লাগল। মধ্যরাত পর্যন্ত ওদের কখনও বসে. কখনও বা শুয়ে প্রায় জেগে জেগেই কাটল। এইভাবে পরস্পরকে চিনে-জেনে ওদের দেহমন যখন অপূর্ব রভসে ভরপুর হয়ে উঠল, তখন ওরা উত্তাল তরঙ্গে ভাসছে। তারপর এক অনাস্বাদিত ভাল-লাগার গভীর সমুদ্রে ওরা ছ'জনেই যেন তলিয়ে গেল। চারপাশে তখন শেষ রাত্রের স্তব্ধতা থমথম করছে।

*　　　*　　　*

ভোরবেলা সূর্য ওঠার আগেই পদম ফিরল। পদমের মুখটা স্তব্ধ কালো রাতের মতই থমথম করছে। রূপচাঁদের আন্দাজ যে ঠিক তা জানা গেল। মায়ের প্রসাদ নয়, বাবাব প্রসাদই ছিল থলের মধ্যে। আগে জানতে পারলে পদম এই রকম আহাম্মকের মত কাজ করত না।

পদম ঘরের বারান্দায় মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর গভীর শ্বাস ছেড়ে বলল, হামি এইসা জিয়াদা বেঅকুব আছি! আউর উন্‌লোগ এইসা শয়তান! হামার জেরবার করে দিয়েছে।

রূপচাঁদ বলল, আভি তো আপ্‌লোগ সব কুছু সমঝ গিয়েছেন! ফির উধর যাবেন না!

টগর রূপচাঁদের দিকে অবাক হয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। রূপচাঁদ সিদ্ধপুরুষ নাকি! নচেৎ কী করে সে জানল নন্দকিশোর

সরকার গঙ্গার ওপারে মায়ের প্রসাদ নয়, বাবার প্রসাদ অর্থাৎ গাঁজা হাসিশ চালান দেবার জন্যে ওর বাপ পদমকে পাঠিয়েছিলেন।

টগর পদমের দিকে তাকিয়ে বলল, এ বাপু, ছোড়্ দো, সোচ্‌নেসে আউর কেয়া হোগা ?

পদম বলল, কুছ্ নহী বেটি, গঙ্গা পানিমে নাহানেসে ইয়ে পাপ দূর্ নহী হোতা।

এমন সময় শুখরাম এল। পদম সব কথা শুখরামকে খুলে বলল। পদমের কথা শুনে সেও খুব আফসোস করতে লাগল। সাধু আর সরকার যে কী চীজ্ তা এতদিনে সকলের মালুম হল। মন্দিরের ভেতর থেকে সাধুবাবা নিজের হাতেই তো ওসব মাল বার করে পদমের হাতে দিয়েছেন। সরকার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে সব কিছু তদারক করেছেন। মায়ের মন্দিরকে ওরা অপবিত্র করে দিল ! শুখরাম জানাল পদমভাই এইরকম গুনাহের রাস্তায় আর কখনও যেন পা না দেয়।

কিন্তু পদম আর শুখরাম দু'জনেই আরও অবাক হয়ে গেল রূপচাঁদ আর টগরের কথা শুনে। রূপচাঁদ কাল রাতে টগরের ঘরে পাহারা না-থাকলে তো আজ এই বিহানবেলায় আর টগরকে খুঁজেই পাওয়া যেতনা। টগরকে লোপাট করে কোন মুলুকে পাঠিয়ে দিত কে জানে ! কিংবা ওদের কী উদ্দেশ্য ছিল তাই বা কে জানে ! পদম ও শুখরাম এতসব ঘটনায় দু'জনেই বড় ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়ল। আর দেরী না-ক'রে পদম আর দোস্ত শুখরাম দু'জনে মিলে একটা শুভ দিনক্ষণ দেখে রূপচাঁদের সঙ্গে টগরের বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করে ফেলল। আর সেই বিয়ে যাতে জলদি দেওয়া যায় তাও আজই ঠিক ভাবে মনস্থ করা হল।

এবং কয়েক দিনের মধ্যেই একটা শুভ লগ্ন দেখে ওদের দুজনের অনাড়ম্বর বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের দিন দু'চার ঘর দোসাদ, ভাঙ্গি, মুর্দাফরাস পেট ভরে ফলার খেয়ে গেল।

* * *

ওদিকে বেশ কিছুদিন ধরে হাসপাতালে পড়ে থাকল হুলো আর

ঢ্যাং দু'জনেই। গুলিটা হুলোর পায়ে লেগেছিল। অপারেশন করে গুলিটা বার করা হয়েছে বটে, কিন্তু সরকারী হাসপাতালে অব্যবস্থার ফলে ক্ষতস্থানে ভেতরে ভেতরে পচন ধরেছে। ডাক্তারবাবু জানিয়েছেন পুরো ঠ্যাংটা কেটেই বাদ দিতে হবে। আর ঢ্যাঙের বুকের দোষ হয়েছে। সেদিন রাতে ছুটে পালাতে গিয়ে সে হোঁচট খেয়ে পাথরের ওপর পড়ে যায়। বুকে প্রচণ্ড চোট লাগে। ওকেও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। খুব জোর বেঁচে গেছে এবং বেঁচেও থাকবে আরও কিছুদিন. কিন্তু এরপর খুব বেশী ছোটাছুটি করলে আর বেশীদিন টিকবে না। ফলে একজনের ঠ্যাং কেটে আর অন্যজনকে কাঁধে চাপিয়ে দুই অকেজো আধমরা ঘোড়াকে আস্তাবলে ফিরিয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেন সরকার। নন্দকিশোর একবার ভাবলেন. আর অকারণে এদের পুষে দানা খরচ করে কী লাভ হবে! তার চেয়ে এই দুটো অপদার্থকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলাই ভাল। তারপর দুটো তাজা তাগড়াই ঘোড়া খুঁজে আনা যাবে। নচেৎ কোনক্রমে যদি ওদের মুখ থেকে কথা ফাঁস হয়ে যায় তাহলে ঘোর বিপদ। নিজেদের দুর্দশার কথা ভেবে এখন ওরা সব কিছু ফাঁস করেও দিতে পারে। কারণ সেদিন রাতে যে-কাজের ভার নিয়ে ওরা অন্ধকারে হানা দিয়েছিল, কাজ হাসিল হোক বা না-হোক, ওরা সুস্থ থাকলে কোন ভয় ছিল না। কিন্তু এখন ওদের ওপর কতটুকু আস্থা রাখা যায়? টাকা তো জলের মত খরচ হয়ে গেলই, কাজের কাজ কিছুই হল না। তার ওপরে ওদের মুখ থেকে যদি ভবিষ্যতে কিছু ফাঁস হয়ে যায়, তাহলে তো চরম কেলেঙ্কারি রটবে, আগামী শুভ কাজ সব মাটি হয়ে যাবে, উপরন্তু চরম ধ্বংসের মুখে নন্দকিশোর ধনেজনে মারা পড়বেন। সুতরাং গোটা ব্যাপারটা খুব ভালভাবে খতিয়ে দেখা দরকার।

নন্দকিশোর এবার দ্বিতীয় কথা ভাবলেন। সেদিন রাতে খুব ভাল মত খোঁজখবর না-নিয়ে ওদের দু'জনকে পাঠানো ঠিক হয়নি। পদম ওকে ভুল রিপোর্ট দিয়েছিল বলেই হিসাবে এই গোলমালটা ঘটেছে। শুখরামের বেটা রূপচাঁদের তো সে রাতে থাকার কথা ছিল

না। পদম ওকে সেই রকম আভাসই দিয়েছিল। কিন্তু সুযোগ বুঝে সে ছোঁড়া ফিরে এসে পদমের বেটির ঘরেই ঢুকবে তা কে জানত! এ-ব্যবস্থা পদম নিজেই করেছিল কিনা কিংবা পদমের অজ্ঞাতে ঘটেছে কিনা তাই বা কে জানে! তবে সে রাতে ওরা সহবাস করবে জানলে নন্দকিশোর অন্যরকম ফিকির খুঁজত। বাবাঠাকুর একবার বলেছিলেন অকুস্থলের মৃত্তিকা সংগ্রহ করতে পারলেও কাজ হয়। তাহলে নন্দকিশোর এসব ঝামেলায় যেত না! কারণ পদমের বেটিকে ঘর থেকে অজ্ঞান করে তুলে আনা তো সহজ ব্যাপার নয়। ছুঁড়িতো চেঁচামেচিতে কম যায় না, গোটা দেশকে জড়িয়ে বেড়ায়। তবে লোকালয় দূরে বলেই একটু সুবিধা। কিন্তু ওর সঙ্গে রূপচাঁদ জুটলে, আই বাপ! সে তো খুন-খারাপি ব্যাপার! কে খামোকা ওসব ঝামেলায় জড়াতে যায়?

তবে যা হবার হয়ে গেছে, যা হারিয়েছে তা আর ফিরে পাওয়া যাবে না। তবে একটু সুবিধা যে লোক জানাজানি বা থানা পুলিশ এ সবের কোন ভয় নাই। কারণ স্মাগলার রূপচাঁদ এ-ব্যাপারে এক পা এগোবে না। কে আর মাটি খুঁড়ে কেঁচো তুলতে গিয়ে ঘুঘরো বার করতে যায়! সুতরাং ওদিক থেকে কোন ভয় নাই। ভয় শুধুমাত্র হুলো আর ঢ্যাঙের মতিগতির ওপর।

নন্দকিশোর এই সব ভেবে সাধুবাবার সঙ্গে গোপন সলাপরামর্শ করতে বসলেন।

সাধুবাবা জানালেন, অত দুশ্চিন্তার কিছু নাই। আমার কাছে নানারকম গাছগাছড়ার ওষুধ আছে, সেঁকো বিষও আছে। এত ঝটপট ওদের মেরে ফেলা ঠিক হবে না, তাতে মানুষের মনে সন্দেহ জাগবে। বরং ওষুধ দিয়ে আরও কিছুদিন টিকিয়ে রাখা ভাল। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। আপনি আরও দু'জন তাগড়াই জওয়ান খুঁজে পেতে বার করুন। হুলোর জন্যে একটা ক্রাচ্ বানিয়ে দিন। তারপর চারজনকে এবার ছেড়ে দিয়ে দেখা যাক কাজ হাসিল হয় কিনা। একটা হাত ফসকে বেরিয়ে গেল বলে কি আর একটা ধরা যাবে না?

আপনাকে আরও কিছু খরচ করতে হবে, আরও একটু ধৈর্য ধরে ক'টা দিন অপেক্ষা করতে হবে, তাগড়াই জওয়ানও মিলবে। তবে শনিবার, অমাবস্যার রাত! এমন অমৃতযোগ আবার কবে মিলবে সেটাই হল আসল কথা।

নন্দকিশোর বললেন, আপনি সেটা দেখুন বাবাঠাকুর, টাকা যত লাগে আমি দিব, লোকও জোগাড় করব। কিন্তু আপনাকে তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হবে। আমাকে কবচ বানিয়ে দিতেই হবে, যাতে আমি সে রাতেই ধারণ করতে পারি। আচ্ছা বাবাঠাকুর, আপনার কবচে সব বিপদ-আপদ কাটবে তো? অফুট টাকা রোজগার হবে তো?

—নিশ্চয়। কিন্তু সেজন্যে আমাকে সিদ্ধাই অর্জন করতে হবে। আমার যোগ সাধনার সময় যা যা লাগবে তা তো আপনাকে জোগাড় করে দিতে হবে। উপকরণ না হলে তো সিদ্ধাই হওয়া যায় না।

—আমি তো তন্ত্রফন্ত্র বুঝি না বাবাঠাকুর। তবে আপনাকে তো সবই জোগাড় করে দিয়েছিলাম, আবার দিব। ফের যদি একই উপকরণ জোগাড় করে আনা যায় তো কাজ হবে বাবাঠাকুর?

—হতে পারে। তবে তার আগে ওই ডোম ছোঁড়াটাকে তো দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। তা না-হলে সমস্ত শুভ কাজে ওই ছোকরা ভয়ানক গণ্ডগোল বাধাবে।

—ও ছোকরা তো স্মাগলার। ওকে হাজতে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারি, ওর পিছনে পুলিশ, কিছু মাস্তান আর আমার পোঁ-ধরা কিছু খাতক লেলিয়ে দিতে পারি! তবে সেটাও এক্ষুনি হবে না, বেশ দু'চারদিন সময় লাগবে। কিন্তু ওকে সরানো মুস্কিল। ওর পিছনে খুবই মজবুত দল আছে। ওর দল দুনিয়া থেকে আমাকেই সরিয়ে দিতে পারে। সেদিন রাতে ও-ছোকরা এই এলাকায় থাকবে না জেনে, আর পদমকেও সরিয়ে দেওয়া গেল দেখে, তবেই কাজে হাত দিয়েছিলাম। পাকা বন্দোবস্ত ছিল, কিন্তু কপাল খারাপ। মিথ্যা রিপোর্ট দিয়েছিল শালা আমাকে। এদের যত নেকা ভাবছেন, তা নয়। এরা সব নচ্ছার জিনিস।

—তাহলে ব্যাপারটা টের পেলে তো আমাদের জেরবার করে ছাড়বে।

—সে তো বটেই! ওদের ডেরায় সেঁধানো কি সোজা কম্ম ভাবেন? আমি যেবার শ্মশানে কাঠ সাপ্লাইয়ের কণ্ট্রাক্ট পেলাম সেবার মিউনিসিপ্যালিটির অফিস থেকে জানানো হল যারা কাজের অভাবে ভিন্ন পেশা নিয়েছে তারা শ্মশানের কাজে ফিরে যাবে। আগে তো কেউ কণ্ট্রাক্ট নিত না, আর অফিসও এসব নিয়ে মাথা ঘামাত না, ফলে ডোমেরা যে-যেমন স্বাধীন ভাবে চলত। শেষ দিকে পদম ছাড়া এখানকার শ্মশানে কোন ডোম কাজই করত না, রূপচাঁদ মিউনিসিপ্যালিটিতে ঢোকার পর শুখরামও কাজ ছেড়ে দিয়েছিল। ওই ব্যবস্থার ফলে রূপচাঁদকে জাত-ব্যবসায় ফিরে যেতে বলা হল। কিন্তু সে ছোকরা এপথ মাড়ানো তো দূরের কথা, সে ভদ্দরলোকের ছেলেদের দলে ভিড়ে মাস্তানি জুড়ে দিল। কিছু লোক পিছনে মদত যোগাতে লাগল। তারপর শুরু হল স্মাগলিং। এইসব ছোকরাদের খাঁই তো কম নয়, গায়ে-গতরে অশুরের মত শক্তি! পিছনে ঠেকনা দেবার মত দু'চার জন খাপ্পা খাঁ দু'দিনেই জুটে গেল। আর কী চাই বলুন? এদের মধ্যে রূপচাঁদ ছোকরাটা আবার সাক্ষাৎ দত্যি! এদের বেশী না-ঘাঁটানোই ভাল।

—তাহলে এটাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য একটা খোঁজ করুন। একেবারে আনকোরা হলেই কাজটা বেশ মজবুত হয়। আমি তো এখানে নতুন, এতসব ঘটনা জানতাম না, জানলে আপনাকে এ পথে এগোতে বারণ করতাম! আপনি তো আমাকে আগে সব কথা খুলে বলেন নি।

—বলিনি, অতটা মাথায় আসে নি। এখন ব্যাপারটা ভেবে দেখছি কাজটা ঠিক হয় নি। তাছাড়া আপনি তো বার বার এটার ওপরেই জোর দিয়েছিলেন, আমিও ঝোঁকের মাথায় এগিয়েছি।

—আচ্ছা, এটা নিয়ে ওরা আবার কোনরকম ঝামেলা কিংবা থানা পুলিশ এসব করবে না তো? কিংবা ধরুন, টের পেয়ে একেবারে আপনাকেই খতম করে দিল। আমাকেও দিতে পারে—

—মনে হয় না। ঝামেলা পাকাবার ইচ্ছা থাকলে এত দিনে করত। আর থানা পুলিশে তো যাবেই না। ওরা নিজেরাও তো দাগী মাল! আগেই তো ব্যাপারটা ভেবেছি কেঁচো খুঁড়ে তুলতে গিয়ে ঘুঘরো বেরিয়ে পড়বে এটা ওরাও চাইবে না। তবে এখন থেকে আমাদেরও খুব সাবধান হয়ে চলতে হবে।

—সেই ভাল। আপনি অন্য পন্থা নিন, আমিও নেব। আর পশু শক্তি প্রয়োগ নয়, এবার যোগমন্ত্র বলে অন্যরকম ভাবে বশীভূত করার পথ গ্রহণ করতে হবে। সে আমি ঠিক করে নেব, আপনি শুধু দ্বিতীয় পথের সন্ধান দিন। মনের কথা কাউকে খুলে বলবেন না। খুব গোপনে সমস্ত কাজ-কারবার সেরে ফেলবার চেষ্টা করবেন। আপনার অন্তরে যাই থাক, বাইরে ভাল মানুষ সাজবেন, খুব লম্বা-চওড়া বাত ঝাড়বেন। আর একটা কথা, আপনাব পিছনে মাস্তান আর পোঁ-ধরা লোকের দল মজবুত রাখবেন। অফিস, পুলিশ, আইন-আদালত এসব শক্ত কবজিতে ধরে রাখবেন। এ ছাড়া এ যুগে মানুষের মত বাঁচা মুস্কিল।

—ঠিকই বলেছেন বাবাঠাকুর। সে চেষ্টা তো করেই চলেছি। আপনাদের আশীর্বাদে চট-জলদি কিছু না-হলেও আসলি জায়গায় পৌঁছে যেতে পারব। যাই হোক, আপনি দু'নম্বর লাইন নেন, আমিও নিই, কাজের ধারাও সব পাল্টে দেওয়া যাক। মনে হয়, আসান কিছু একটা হবেই হবে।

—দেখা যাক। আরও একটা কথা বলে রাখি, মনের গোপন কথা ঘরের স্ত্রীকেও জানাবেন না, কাউকে বিশ্বাস করবেন না। কে যে কখন কার বিপদ ডেকে আনে বলা যায় না। মনে রাখবেন, যে-কোন শুভ কাজে বিপদ প্রেতাত্মার রূপ ধরে চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। ধৈর্য, সাহস আর অদম্য চেষ্টা নিয়ে আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে। অত হাঁকপাঁক করে কাজ করতে যাবেন না। আগে ধর্ম-মহাসম্মেলন ডাকতে হবে। তারপর ধীরে সুস্থে বেশ ধাতস্থ হয়ে কাজ হাসিল করতে হবে। আগে লোকের মনে আমাদের সম্পর্কে আস্থা আর

বিশ্বাস আনতে হবে। কাজে একটু ভুলচুক হলেই সমূহ বিপদ। খুব হিসাব করে চলবেন। আপনার চলার ওপরে আমার খাড়া হয়ে দাঁড়ানো নির্ভর করছে। আপনি ডুবলে আমিও কাত।

—তা যা বলেছেন। তাহলে আগে ধর্মসভার আয়োজন করা যাক। আমি বলি কি গাঁজার কারবারটা কটা দিন বন্ধ থাক। আপনি কি বলেন? কারণ, পদম তো নতুন লোক। তাছাড়া মনে হয় সেদিন ও বেটা আমাকে মিথ্যা রিপোর্ট দিয়ে ফাঁসাতে চেয়েছিল। গুরু রক্ষা করেছেন এই যা। কিন্তু ওকে মোটেই বিশ্বাস করা যায় না।

—সে তো বটেই! হুলো আর ঢ্যাঙের মত সে তো বিশ্বাসী নয়। অবস্থাটা কিছু দিন ভালভাবে পরখ করুন। আরও কিছু লোক জোগাড় হলে তারপর ঝোপ বুঝে কোপ মারা যাবে।

—এটাই ভাল যুক্তি, শেষকালে তাই করতে হবে। কিন্তু আমি ভাবছি কি শুধু মড়ার কাঠ বিক্রির টাকায় এত বড় দক্ষযজ্ঞ কি সামলানো যাবে?

—তা কেন, সম্মেলন তো হবে চাঁদা তুলে। তাছাড়া আপনার শহরে তো আরও একটা কাঠের কারবার আছে। সেখানকার গোলায় কাঠের মজুত যেমন বেশী, বিক্রি করে তো আপনার লাভও প্রচুর। আপনি তো আর হালে উঠতি মহাজন নন, আপনি হলেন বনেদী ব্যাপারী।

—তা বলতে পারেন। তবে উ মোকামের টাকায় আমার হাত দেবার ক্ষমতা নাই। বিয়ের সময় শ্বশুরের কাছ থেকে যে নগদ পেয়েছিলাম, উ কারবারে আমার সেই টাকা খাটছে। আমার ছোট শালার ওপর দায়িত্ব দেওয়া আছে, সে সব কিছু দেখাশুনা করে, শ্বশুরের মেয়ে সব লাভের কড়ি গুণে বাক্সে তুলে রাখে। উখানে হাত দিতে গেলে ঘরে আগুন লেগে যাবে। সেই জন্যেই তো বাইরের এইসব ফালতু খরচ সামলাবার জন্যেই গাঁজার কারবারটা জুড়েছিলাম।

—বিয়েতে যে-নগদ পেয়েছিলেন সে-টাকায় যে-ব্যবসা করছেন সেটা তো আপনারই ব্যবসা। সময় দিতে পারেন না বলে দেখাশুনার

ভার দিয়েছেন ছোটশালার ওপর। কিন্তু মূলধন আর কারবারের লাভ তো আপনারই। পুরো টাকাটা স্ত্রীর কাছে গচ্ছিত থাকছে এবং স্ত্রী মানে আপনারই স্ত্রী।

—কী করে হল? যে-টাকায় হাত দেবার ক্ষমতা নাই তা আমার নয়। আমাকে পাঁচরকম ব্যবসা করেই টাকার সুরাহা করতে হবে। শুধু গাঁজা নয়, আরও বহু রকম কারবার জুড়তে হবে।

—সব দিকের অবস্থা বুঝে, কটা দিন থেমে আপনাকে গাঁজার কারবারটা লাগাতার চালিয়ে যেতে হবে। তবে খুব হিসেব করে মেপে পা ফেলে চলবেন।

—সে তো বটেই! তাই করতে হবে, তাছাড়া উপায় কী? গাঁজার কারবার তো চলবেই।

—এ ছাড়া আপনি আর কী ব্যবসার কথা বলছিলেন সরকার মশাই?

—বলব, সময় হলে সবই বলব। আপনি আমাকে কিছু জ্ঞান-মার্গের উপদেশ দিবেন, আর আমি আপনাকে কিছু বৈষয়িক জ্ঞান দিব। দু'জনের আঁতাত যদি ঠিকমত চিরকাল বহাল থাকে তো দেখবেন বাবাঠাকুর অচিরেই গোটা দেশ আমাদের মুঠোর মধ্যে চলে আসবে।

রতনে রতন চেনে, শুয়োরে চেনে কচু। নন্দকিশোর সরকার যেমন সাধুবাবাকে ঠিক চিনে নিয়ে এসেছেন। সাধুবাবাও তেমনি গোপাল ঠাকুর. শালুক চিনেছেন, নন্দকিশোর সরকারকে চিনে এখানে এসে হাজির হয়েছেন। দু'জনের এই চেনা-জানার ফলে শ্মশান এলাকার কিছুটা উন্নতি হয়েছে, ঝোপজঙ্গল সাফ হয়ে এলাকার আয়তনও কিছুটা বৃদ্ধি হয়েছে। অবিশ্যি নিন্দুকের তো অভাব নাই। এইসব দেখে কেউ কেউ বলেছে সাধু আর সরকার শেষ পর্যন্ত গোটা দেশকে শ্মশান বানিয়ে দেবে।

সাধুবাবা বললেন, আমিও তো তাই চাই সরকার মশাই, গোটা দেশকে মুঠোর মধ্যে আনতে চাই। কিন্তু দেখবেন, আপনার কোন কাজের ভুলে আমাদের অধঃপতন যেন না ঘটে। তাহলে আমাকেও

চরম বিপদের মুখে পড়তে হবে। সেরকম ব্যাপার ঘটলে পুরো দায়িত্ব আমার হাতে ছেড়ে দেবেন।

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার কোন বিপদ হবে না। আগে কথামত কাজ শুরু হোক।

সুতরাং নির্ধারিত কথা অনুযায়ী সব কাজ শুরু হয়ে গেল। সেই কথামত হুলো আর ঢ্যাং বেঁচে রইল। সরকার মশাই আরও দু'জন তাগড়াই জোয়ান আমদানী করলেন। একজনের নাম রাখলেন হুপো, আর একজনের নাম হল চ্যাং। চারজনের নামই সরকার মশাই রেখেছেন। নতুন দু'জনকে ডন-কুস্তি, ডলাই-মলাই, বদ্ধা-গোত্তা দিয়ে তৈরী করা হল। সরকার মশাই চারদিকে চার চোখ রেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলতে লাগলেন। আর সাধুবাবা শ্মশানে বসে থেকেই চোখ দুটোকে এমন ভাবে খোলা রাখলেন যাতে খালি চোখের দৃষ্টি বেশ দূরবীনের মত কাজ করে।

* * *

পূর্ণিমা তিথিতে ধর্ম-মহাসম্মেলনের আয়োজন করা হল। নন্দ-কিশোর সরকার শহরের ভদ্রজনদের নিয়ে একটা কমিটি তৈরী করলেন। প্রচুর টাকা চাঁদা উঠল। বহু শিষ্য ভক্ত আর ছেলেছোকরার দল জুটে গেল। সম্মেলনের দিন যতই এগিয়ে আসতে লাগল, সারা শহর জুড়ে ততই সোরগোল পড়ে গেল। সাতদিন ধরে শহরময় সে কী তুলকালাম কাণ্ড। সকাল-সন্ধ্যে খোল-করতাল নিয়ে নাম-সংকীর্তনের দল বেড়িয়ে পড়ল। গানে, নিশানে, শ্লোগানে, শোভা-যাত্রায়, হুলুধ্বনিতে পথঘাট থৈথৈ করতে লাগল। ধূপদীপ মালাচন্দন আর ধর্মকথায় সারা শহর মেতে উঠল। দেশবিদেশ থেকে সাধুসন্তের দলও এসে জুটতে লাগল। এমন ঘটনা এ-শহরে ইতিপূর্বে কখনও ঘটেনি। মানুষজন থ হয়ে দেখতে লাগল। ধর্মের মাতনে, ভক্তির জোয়ারে ধুলো-কাদায় কেউ কেউ গড়াগড়ি খেল। নতুন করে ফের সত্যযুগ ধর্মযুগ ফিরে এল বোধ হয়। শহরের ইতরভদ্র ধনী দুঃখী গরিব কাঙাল সর্ব জাতের আপামর জনগনের মধ্যে ঠাকুর-দেবতার

ওপর ভক্তির বন্যা বয়ে গেল। সকলের মধ্যে কেমন যেন একটা বিনয়ের ভাব ফুটে উঠল। এ যেন এক মহাজাগরণ। কেউ কেউ প্রায় অবতার হয়ে-ওঠার কায়দা রপ্ত করতে লাগল।

ঠিক হল প্রথম দিন সম্মেলন হবে। ধর্ম মহাসভা, গান, আলোচনা। আর দ্বিতীয় দিন ধনী দরিদ্র কাঙাল হরিজন সকলেই একসাথে পংক্তি ভোজে বসে অন্নকূট গ্রহণ করবে।

শহরের মাঝামাঝি একটা ছোটখাটো ময়দানের এক প্রান্তে মঞ্চ তৈরী করা হল। মঞ্চের সামনে সারা ময়দান জুড়ে ছাঁটা-ঘাসের ওপর ভক্ত-শিষ্য ও পুণ্যবান নারীপুরুষদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বসার জায়গা নির্ধারিত হল। কমিটির অনুপুঙ্খ তত্ত্বাবধানে যাবতীয় কাজ সুন্দরভাবে এগিয়ে চলতে লাগল। চারপাশে সূক্ষ্ম নজর রাখার মূল দায়দায়িত্ব নন্দকিশোর সরকার নিজের হাতে রাখলেন।

পূর্ণিমা তিথিতে মূল সম্মেলনের দিন ভোর থেকেই দলে দলে মানুষজন আসতে শুরু করল। দেখা গেল মঞ্চের ওপরে সাধুবাবা উষালগ্ন থেকেই ধ্যান যোগে বসেছেন। সারা মাঠ নাম-গানে, খোল-করতালের ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠতে লাগল। দলে দলে কীর্তনীয়া দল এসে আসন নিতে শুরু করল। সাধুবাবা আগেই সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের কথা সোচ্চার ঘোষণা করেছেন। সুতরাং শুধু শাক্ত বা বৈষ্ণব নয়, যে-কোন জাত ও ধর্মের মানুষ এই সম্মেলনে আসতে পারে। সাধু-বাবা বলেছেন, মনুষ্যধর্মই আদত সত্য। তার ওপরে অন্য কোন সত্য নাই। ফলে বেলা যত বাড়তে লাগল, ভিড়ও তত বাড়তে লাগল।

সাধুবাবার ধ্যান ভাঙল বেলা আটটা নাগাদ। তারপর সাধুবাবা আচমন সেরে বেদমন্ত্র পাঠ শুরু করলেন। বেদের ভাষ্য টীকা যোগে ব্যাখ্যা ক'রে সকলকে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। কয়েক ঘণ্টা ধরে সাধুবাবা এইসব সারতত্ত্ব সকলকে এমন ভাবে বুঝিয়ে দিলেন যাতে জানা গেল ধর্ম ছাড়া মানুষের গতি নাই, ঈশ্বর ছাড়া মানুষের মুক্তি নাই। সাধুবাবার কাছেই নাকি সবাই জানতে পারল পরম ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। এ ছাড়া দ্বিতীয় কোন সত্য নাই। আর প্রত্যেক

মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে সেই পরম ব্রহ্মের সত্তা বিরাজ করছে। যতক্ষণ সাধুবাবা ভাষণ দিলেন, ততক্ষণ বুঝুক বা না-বুঝুক কেউ কেউ মাথা নেড়ে সাধুবাবার কথার তারিফ করতে লাগল। কেউ কেউ পাশা-পাশি বসে ঘর-সংসারের গল্প জুড়ে দিল। পরচর্চা থেকে শুরু করে যৌনতত্ত্ব সবই এসে গেল গল্পের খাতিরে। কিন্তু তার ফাঁকে প্রায় সকলেই মাথা দুলিয়ে সাধুবাবার ভাষণের গুণগান করতেও ভুলল না।

এরপর বেলা বারোটা থেকে দীক্ষা দান পর্ব শুরু হল। দলে দলে নারী-পুরুষ সাধুবাবার কাছে দীক্ষা নেবার জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়াল। সাধুবাবা একে একে সকলের কানে কানে বীজ মন্ত্র দিলেন, আর হাতে দিলেন চন্দন-মাখানো তুলসীর পাতা।

উত্তাল তরঙ্গের মত ভিড় যেন উপচে পড়ছে। হৈচৈ ধাক্কাধাক্কি চেঁচামেচির অন্ত নাই। যুবকেরা এই সুযোগে যুবতীদের গায়ে ঢলে পড়ার চেষ্টা করছে। যুবতীরা খিলখিল করে হেসে গলে পড়ছে। ভলান্টিয়াররা হট্টগোল থামাতে গিয়ে নাস্তানাবুদ হচ্ছে।

রূপচাঁদ তার দলবল নিয়ে মজা দেখতে গিয়েছিল। তারা সবাই পিছনে ও আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে এইসব দৃশ্য দেখছে। বড় মজার দৃশ্যই বটে!

কে একজন পাশ থেকে মন্তব্য করল : বেশ ভালই কারবার চলছে হে! এসব কী লীলা খেলা শুরু হয়েছে? দেশটাকে বিন্দাবন বানিয়ে দিবে দেখছি!

অপর জন বলল আরে চুপ্, চুপ্! কে কোথায় শুনে ফেলবে! মুখ বুঁজে চোখ আছে দেখে যাও, কান আছে শুনে যাও।

প্রথম জন বলল, ক্যানে কী হবে? যা দেখছি, তাই বলছি।

দ্বিতীয় জন বলল, যা দেখছো তা বলতে হয় না, যা লোকমুখে শুনেছো তাই বলবে। তাও কোথায় কার মুখে শুনেছো অত কথা ভেঙে বলার দরকার কী?

প্রথম জন কিছুটা চুপ করে গেল। শেষে আর থাকতে না-পেরে

মুখ ফসকে বলে ফেলল, এই জন্যি তো শালা ই দেশের উন্নতি হছে না। মাজার জোরই নাই কাহারও।

দ্বিতীয় জন বলল, বটে! খুব বুকের পাটা বেড়েছে দেখছি! বলি ল্যাঠা বাধলে সামলাবে কেডা, ভেবে দেখেছো?

তুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল হয়ে এল। সাধুবাবার দীক্ষাদান পর্ব শেষ হল। এরপর শুরু হবে সাধুবাবার ভাষণ দান পর্ব। সাধুবাবা কিছু সময়ের জন্য মঞ্চের নেপথ্যে গেলেন। তিনি এই সময়ের মধ্যে আচমন, আহ্নিক সেবে রাবড়ি সহযোগে অল্প সামান্য জলযোগ ক'রে নেবেন। তারপব তিনি ফের শুদ্ধাচারে মঞ্চে এসে দাঁড়াবেন মূল ভাষণ দেবার জন্য। সাধুবাবা যখন হাতমুখ ধুতে গেলেন সেই সময় কীর্তনীয়া দল মঞ্চে উঠে এল তাদের কেবামতি দেখানোর জন্যে। নাম-সংকীর্তন শুরু হবার আগে একজন স্থানীয় গায়ক শ্যামাসঙ্গীত গেয়ে শোনালেন। কিন্তু ছেলে-ছোকরার দল হিন্দী ফিলিমের গান শুনতে চাইল। ওদের দাবির কথা কেউ কানে তুললনা দেখে ওরা বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ল।' কিছুক্ষণ আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে নাম-সংকীর্তন চলল। খঞ্জনি ও খোল-করতালেব ধ্বনিতে কান ঝালাপালা হয়ে উঠল। কিছু লোক ভাবে গদগদ হয়ে হুলু ও হরিধ্বনি দিতে লাগল।

সাধুবাবা যখন ফের মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন তখন চারপাশে সন্ধ্যার অন্ধকার প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। মঞ্চে ও মাঠের চারদিকে আলো জ্বলে উঠেছে। সাধুবাবা শান্ত সংযত চিত্তে মাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন। কেউ কেউ তাঁর চেহারার সঙ্গে দেবদূতের মিল খুঁজে পেল। কিছু লোকজন তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে পয়গম্বব বলেও ভাবল।

সাধুবাবা মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে শান্ত থাকার এবং ধর্মানুরাগী হবার অনুরোধ জানিয়ে ভাষণ শুরু করলেন। ঠিক সেই সময় কোত্থেকে কী হল কে জানে, হঠাৎ আলো নিভে গেল। আলো নিভে যেতেই মানুষজনের ভিতরে একটা মৃত্ গুঞ্জন শুরু হল। কিন্তু মাইকে বারবার দেশবাসীকে শান্ত ভাবে বসে থাকার নির্দেশ ঘোষণা করা হল এবং চটজলদি ভিন্নপ্রকার আলোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে

বলেও আশ্বাস জানানো হল। এইটুকু সময়ের মধ্যেই যুবক-যুবতীরা পরস্পরকে চিনে কাছাকাছি সরে এসে ভাবের আদান-প্রদান শুরু কবে দিল। অন্ধকার যেমন নানারকম সুযোগ এনে দেয়, তেমনি বেরসিকেব নাভিশ্বাস তুলে ছাড়ে। এখানেও তাই ঘটল। কিছু-লোকের অন্ধকারে দম বন্ধ হয়ে যাবাব উপক্রম হল। কেউ কেউ ভিড এড়িয়ে ফাঁকা জায়গায় যাবার পথ হাতড়ে খুঁজতে লাগল। এই অবস্থা চলল বেশ কিছুক্ষণ। মাইকে জনসাধাবণকে বাববাব শুদ্ধ, শান্ত ও সংযত থাকার নির্দেশ ঘোষণা কবা হতে লাগল।

কিন্তু পবমুহূর্তেই আর একটা কাণ্ড ঘটল। মঞ্চের পিছনে কিছুটা দূরে হঠাৎ একটা বোমা ফাটল। শুধু একটা নয়, আশপাশে পর পর আবও চাবটে বোমা ফাটাব শব্দ শোনা গেল। গোটা মঞ্চটা একেবারে থরথব কবে কেঁপে উঠল। ভিড়েব মধ্যে নবনারীর চীৎকাব-চেঁচামেচি, আতঙ্কের শব্দ, ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি প্রচণ্ড ভাবে বেড়ে গেল। যে যেমন পাবল হুড়দাড় ক'বে মাঠ ছেড়ে ছুটে পালাবাব চেষ্টা করতে লাগল। এই সময় অন্ধকারে যুবক-যুবতীদের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ টানা-হেঁচড়া শুরু হয়ে গেল। তাতে কিছু কিছু শাড়ি ব্লাউজ অন্তর্বাস নাকি ফেঁসে ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই হয়ে গিয়েছিল। দু'একজনেব অবস্থা নাকি এমন স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল যে লজ্জা নিবাবণের জন্য শুধুমাত্র অন্ধকারকে সম্বল করেই অকুস্থল ছেড়ে পালাতে হয়েছিল।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আর মাঠে বেশীক্ষণ কাউকে দেখা গেলনা। প্রাণ ভয়ে সবাই কিছু সময়ের মধ্যেই মাঠ ছেড়ে পালিয়ে গেল। মাঠ ফাঁকা হয়ে যাবার পর আরও দুটো বোমা পড়ল। এবার প্রায় ফাঁকা মাঠেই যেন গোল হল। জনমনিষ্যি কাউকে আব মাঠের ত্রিসীমানায় দেখা গেলনা। ফাঁকা মাঠ ও মঞ্চ এই অন্ধকাবে নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইল।

নন্দকিশোর সরকার ও সম্মেলন কমিটির সভাপতি পাশাপাশি মঞ্চে বেশ বুক ফুলিয়ে বসেছিলেন। পালিয়ে আসবার সময় নিজের কাপড়ের কোঁচা ভেবে একে অন্যের কোঁচা হাতের মুঠোয় ধরে সেই

ভাবেই নাকি মঞ্চ ও মাঠ ছেড়ে রাস্তা পর্যন্ত প্রায় জড়াজড়ি ক'রে ছুটে এসেছিলেন। রাস্তায় এসে অনেকক্ষণ ধরে টানা-হেঁচড়ার পর চোখের ধাঁধা কাটতেই পরস্পর ভুল বুঝতে পেরে দু'জনেই খুব লজ্জা পেয়েছিলেন।

এইরকম বিপদের সময় নন্দকিশোর সরকার হুলো, হুপো, চ্যাং, চ্যাং কাউকে খুঁজে না-পেয়ে খুব রেগে গেলেন। ওরা চারজনেই প্রাণভয়ে পালিয়েছে কিংবা কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে কিনা কে জানে! ধারে কাছে কোথাও ওদের ছায়া দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। জলের মত পয়সা ঢেলে তিনি এইসব অপদার্থ নচ্ছারদের পুষছেন! আর এত যে ছেলে-ছোকরা জুটেছিল তারাই বা সব গেল কোথায়? দিনের আলোয় এই সব বীরপুরুষদের কথার কী তেজ! বিপদের সময় এরা তো দেখা যাচ্ছে চুহার অধম! নন্দকিশোর যেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। এইসব ঘটনা ঘটবে তা টের পেলে তো নন্দকিশোর বহু আগে থেকেই প্রচুর পরিমাণে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েনের ব্যবস্থা করতেন।

অনেকক্ষণ পর আবার বিজলি বাতি জ্বলে উঠল। মানুষের ধড়ে ফের প্রাণ ফিরে এল। নন্দকিশোর সরকার দু'একজন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ভয়ে ভয়েই সভাস্থলে ফিরে এলেন। তাঁর সঙ্গে এলেন কমিটির সভাপতি ও আরও কয়েকজন সদস্য। সারা মাঠ জুড়ে ছেঁড়া সায়া-ব্লাউজের টুকরো, ছেঁড়া শাড়ি, দু'এক পাটি ছেঁড়া জুতো ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। নন্দকিশোর লম্বা লম্বা পা ফেলে এসব ডিঙ্গিয়ে ধীরে ধীরে মঞ্চের ওপরে উঠে এসে দেখলেন, সবকিছু কারা যেন লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে। মঞ্চের বাঁশ খুঁটি পর্দা ভেঙ্গেচুরে ছিঁড়ে রেখে গেছে। কিছু অংশে আগুনে পোড়া চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। সাধুবাবাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। কে একজন বলল, তিনি নাকি অন্তর্ধান করেছেন। শুধু তাঁর খড়ম জোড়া কাত হয়ে একপাশে পড়ে রয়েছে। নন্দকিশোর মাথায় হাত দিয়ে মঞ্চের ওপরেই বসে পড়লেন। তাঁর মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুল না।

খবর পেয়ে পুলিশ আর জেলা সদর থেকে মফস্বল বার্তার দু'একজন সাংবাদিক ছুটে এল। পুলিশ কর্তব্যের খাতিরে মঞ্চ ও ফাঁকা মাঠ পাহারা দিতে লাগল। আর সাংবাদিকরা নন্দকিশোরকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত ক'রে তুলল। সাংবাদিকরা জানাল, দু'দশজন ছেলেমেয়ে জুটিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী সমস্ত ঘটনার একটা দৃশ্যও যদি ফের নাটকীয ভাবে রিহার্সাল দেওয়া যেত, তাহলে তাদের পক্ষে অন্তত দু'একখানা জীবন্ত ছবি ক্যামেরায় তুলে রাখা সম্ভব হত এবং এটা ছেপে বেরুলে দূর-দূরান্তের মানুষ ঘটনার কিছুটা আঁচ পেত। অগত্যা এখন তাদের পুরনো ফাইল ঘেঁটে যে-কোন প্রকার একটা জমায়েতের অনুরূপ দৃশ্য পাওয়া যায় কিনা তা খুঁজে দেখতে হবে। ঘটনা যা-ই হোক-না-কেন, টানা-হেঁচড়া থাকলেই চলবে। সেই ছবির ওপর ঘটনা মনোমত সাজিয়ে নেওয়া হবে।

এইসব কথা শুনে নন্দকিশোর আরও রেগে গেলেন। তিনি কোন কথার জবাব না-দিয়ে এবং কোনদিকে না-তাকিয়ে সাঙ্গো-পাঙ্গদের নির্দেশ দিলেন : আজ রাতের মধ্যেই মঞ্চ খুলে ফেলতে হবে ও মাঠ সাফ করে দিতে হবে। তিনি ওদেব উদ্দেশ্য করে আরও জানালেন, এই ঘটনার যেন কোন সাক্ষী না থাকে।

এই কথা শুনে সাংবাদিকরা ভাঙা মঞ্চ ও ফাঁকা মাঠের দৃশ্য নেবে বলে স্থির করল। কিন্তু শান্তি বজায় রাখার জন্য পুলিশ সবাইকে স্থান ত্যাগ করে চলে যাবার নির্দেশ দিল। পুলিশ নন্দকিশোরকে আরও জানাল পরিবেশ শান্ত হলে পুলিশের তত্ত্বাবধানে মাঠ সাফাইয়ের কাজ শুরু করতে হবে। পুলিশ সর্বপ্রকার সাহায্য করবে। শুধু তাই নয়, আজ রাত্রের মধ্যেই যাতে সব কাজ শেষ করে ফেলা যায় সেদিকেও পুলিশের নজর থাকবে। এরপর পরিবেশ শান্ত রাখার জন্য নন্দকিশোর সদলবলে মঞ্চ ও মাঠ ছেড়ে কিছুক্ষণের জন্য চলে গেলেন। যাবার সময় আড়চোখে খরদৃষ্টি দিয়ে সাংবাদিকদের একবার দেখে গেলেন। অগত্যা সাংবাদিকদের মাঠ ছেড়ে চলে যেতে হল। ছবি তো দূরের কথা, কলম চালানোর মত কোন তথ্যও যোগাড়

করা গেল না। ফলে লোকপরম্পরায় শোনা কথার ওপর নির্ভর করে গল্প বলার ঢঙে ঘটনা সাজানো ছাড়া উপায় রইল না।

এদিকে সারা শহর জুড়ে রাস্তার মোড়ে মোড়ে মানুষজন জড়ো হয়ে নানারকম টীকা-টিপ্পনি কেটে আলোচনা শুরু করে দিয়েছে। রূপচাঁদের দল ঘুরে ঘুরে সব কথা শুনে বেড়াতে লাগল।

রাস্তার এক মোড়ে একজন মন্তব্য করল ঃ মনে হয়, ঘোর রাজনীতির খেলা চলছে।

আর একজন বলল, ল্যাও ঠ্যালা! তুমি আবার ইয়ার মধ্যে রাজনীতি কুথায় পেল্যা ?

—আছে হে, কথাটা পুরানো হলে বুঝবা! বাড়ি গিয়ে কথাটা খতিয়ে দেখোগা।

আর একজন বলল, রাজনীতি না, আখার ছাই! বলেন দুর্নীতি।

ভিন্ন একজন বলল, যাই হোক-না-ক্যানে, কী কেচ্ছা কেলেঙ্কারিটা হল!

আগের জন বলল, কথাটা খুলেই বলেন-না-ক্যানে, মেয়েমানুষের জাত গেল, কত লোক নিখোঁজ হয়ে গেল। ছিঃ ছিঃ! আঁধার হতেই সে-যে কী কাণ্ড শুরু হয়ে গেল···রামো! রামো!···

—আরে বাপু, সেই কথাই তো বলছি। বাপ-দাদার আমল থেকে কখুনো এমুন কাণ্ড দেখিনি হে! আমরা তো সবাই ইখানেই মানুষ হয়ে এতো বড়োটা হল্যাম। ইয়ার নাম কি ধর্ম মশাই, তাই বলেন ?

আর একজন বলল, ঠাকুর আমার মাথায় থাক। ইসব কম্মে আর যেছিনা। এই নাকে কানে খত মশাই। আমাদের বাড়ির মেয়েছেলেরাও তো গিয়েছিল, তা গিয়ে দেখে এলাম ভালয় ভালয় সবাই ফিরেছে, গায়ে কুনো আঁচড় লাগেনি। যাক, গুরু রক্ষা করেছেন মশাই!

পিছন থেকে আর একজন সামনে এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বলল, শুনলাম গোবিন্দর সোমত্ত মেয়েটাকে খুঁজে পাওয়া যেছিল না। তা পরে পেয়েছে বটে, কিন্তুক বুকের জামাটা নাই, তলাকার বস্ত্রটাও খুলে কুথায় পড়ে গিয়েছে। শুধু আধখানা ছেঁড়া কাপড়

কুনো মতে গায়ে জড়িয়ে বাড়ি ফিরেছে নাকি। যাক, তবু অক্ষত দেহে ফিরে এসেছে, এই হল কপালের জোর!

রাস্তার আর এক মোড়ে আবার অন্যরকম আলোচনা হচ্ছে। রূপচাঁদের সাঙাতেরা এখানেও ঘুর ঘুর করে সব কথা শুনতে লাগল।

একজন বলল, আমার মুনে হছে ইয়ার পিছনে কুনো বিদেশীচক্রের হাত আছে।

আর একজন বলল, থাকতে পারে। তবে ইখানকার কুনো দলকে উসকিয়ে দিয়ে কাজ হাসিল করেছে। একটা কিছু নিয়ে মানুষকে তাতিয়ে দিলেই হল, কতক্ষণ লাগে। ব্যস্! সেই ফাঁকে কাজ গুছিয়ে নিয়ে আসল লোকেরা তো পগার পার। ল্যাও, তুমরা আখুন গুঁতাগুঁতি করে মরো।

আর একজন বলল, যাক গা, আসল উদ্দেশ্য কি তা ঠিক বুঝা গেল না। তবে হ্যাঁ, আপনারা যাই-বলেন তাই-বলেন, সাধুর জ্ঞান খুব ভাল আছে।

আর একজন বলল, উসব কথা ছাড়েন, বোমাটা মারল কে, দেখেছেন? ক্যানেই বা মারল?

অপর একজন বলল, সেই তো কথা! ধর্মসভা ডাকল কারা, ভাঙল কারা, কী-যে সব ভিতরের ব্যাপার, বুঝা খুব দায়। গভীর কুনো কূটচক্র ইয়ার ভিতরে বসে কেউ খুব গোপনে ঘুরাছে।

পাশ থেকে আর একজন ঝাঁ ঝাঁ করে তেড়ে এগিয়ে এসে বলল, উসব বড় বড় কথা রাখেন তো মশাই, যারা ধর্মসভা ডেকেছে, তারাই ভেঙেছে। ক্যানে জানেন? কমিটির হাতে আখুন বহু চাঁদার টাকা মজুদ আছে। সব টাকা কমিটির লোকদের পকেটে ঢুকে গেল। আজ বোমা মারল, কাল আর ভয়ে কেউ খেতে আসবে না, কাঙালি ভোজও দিতে হবে না। বুঝেছেন?

পাশ থেকে ভিন্ন একজন বলল, দেখুন গা খোঁজ লিয়ে কাঙালি ভোজ উয়ারা এমনিতেই বন্ধ রাখত, আর আখুন তো কুনো কথাই নাই।

পিছন থেকে আর একজন সামনে এগিয়ে এসে বলল, উটা তো

একটা যুক্তি বটে। আরও কথা কি জানেন? এই ধর্মসভা ডেকে, হৈ-হট্টগোল পাকিয়ে অনেক মামু গাঁজা আফিং চোরাই মাল সব বেহাত করে সরিয়ে ফেলল। বুঝেছেন? নন্দকিশোরই তার মধ্যে একজন কিনা কে জানে? আরও কতজনা আছে।

আর একজন বলল, যাকগা, উসব কথা বলার দরকার কী? কোথায় কে শুনে ফেলবে! লোকটি ভয়ে ভয়ে চারপাশে একবার তাকাল, তারপর বলল, ইসব কথার মধ্যে থাকাও দেখছি নিজের বিপদ ডেকে আনা—

লোকটি দূরে সরে দাঁড়াল, কিন্তু একেবারে চলে গেল না। তাতে বোঝা গেল বাকি কথাগুলো শোনার আগ্রহ ওর পুরোমাত্রায় আছে।

এই সময় কোথা থেকে কে একজন ফুট্ কাটল: কথাটা একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না।

আগ্রহী লোকটি দূর থেকেই বলল, বলছেন তো খুব! প্রমাণ আছে কিছু?

আর যাবে কোথায়! আগের লোকটি এবার উত্তেজিত হয়ে উঠল, ঝাঁজালো গলায় বলল, প্রমাণ করবে পুলিশ, আমার কী দরকার মশাই? আমার কান আছে শুনব, চোখ আছে দেখব, মুখ আছে বলব। বলব না ক্যানে গণতন্ত্রের যুগে? সাধুবাবার এমুন তন্ত্রমন্ত্রের জোর নাই যে আমার মুখ বন্ধ করবে। সত্যি কথা জোর গলায় বলব। আমার ফাটে না ফুটে মশাই! বলে তো দিলাম, তুই এখুন চুলকিয়ে প্রমাণ করগা দাদ না পাঁচড়া।

* * *

একটা নির্জন জায়গায় রূপচাঁদ আর তার সাঙাতরা এবার মিলিত হল।

রূপচাঁদ বলল, বহুত আচ্ছা, সব কাম হামলোগ বিলকুল ফতে কর্ দিয়া। আভি বোলো দোস্ত—

প্রথম জন বলল, খুব ভাল হয়েছে। আমি তো শালা ভাবতেই পারিনি এত সহজে কাজ হাসিল হবে! শালারা ভেবেছিল ধর্মসভা

ডাকলে নিজেদের কুকর্ম ঢাকা পড়বে, শালারা পপুলার হবে, পয়গম্বর হবে।

দ্বিতীয় জন বলল, হ্যাঁ, লে এখুন হ! চারপাশে কেমুন লোকে তোদের বদনাম করছে তা শুনে যা হারামজাদারা! শালারা এখুন সব ঘাপটি মেরে কুথায় সেঁধিয়ে আছে কে জানে!

প্রথম জন বলল, যেখানেই থাক, সব কথা শালাদের কানে ঠিক ঢুকবে।

রূপচাঁদ বলল, তবে হামাদের কুনো তকলিফ হয়নি, বলো দোস্ত।

তৃতীয় জন বলল, তা হয়নি। তবে আমি বলেছিলাম সাধু আর সরকার ছুটাকেই খতম করে দি। ঘরের বৌকে তুলতাই করে লিয়ে যেতে চাইবে, সে শালাদের ছেড়ে দিব? তাছাড়া উ শালারা তো আমাদের লাইনে হাত বাড়াতে আসছে, বড়বাবুকে দিয়ে আমাদের হাজতে পাঠাতে চাইছে। উ শালারা আমাদের দুশমন। দুশমনকে ছেড়ে দিলে বিপদ ঘনিয়ে আসবে। কিন্তু রূপচাঁদ বা তোরা কেউ তো রাজী হলি না—

রূপচাঁদ বলল, আরে দোস্ত, হামি তো ছাড়তে বলিনি, বহেসহে কটা দিন সবুর করে সব তরফ সমঝে লিয়ে কাম ফতে করতে হবে। ঝটপট কিছু করে ফেললে এক দিকে মুস্কিল, ঝামেলা, আউর উধর তখুন উ শালাদের দল মানুষের···মানে,···রূপচাঁদ প্রথম জনের দিকে তাকাল: আংরেজীমে কেয়া বোল্‌তা?

প্রথম জন খেই ধরিয়ে দিল: মানুষের সিম্প্যাথি পাবে।

রূপচাঁদ বলল, হাঁ, ইয়ে ঠিক বাত, মানুষের সিম্পাথি পেলে হামাদের ঘাড়ে তখুন বদনাম চাপবে। ইসমে কুছু সাক্ষী-প্রমাণ মিলবে না, পুলিশ হামাদের তল্লাশ ভি পাবে না, সব ঠিক আছে। লেকিন মানুষের মুনে তো হামাদের ওপর একটা ধন্দ থাকবে, বদনাম ভি রটবে। তাই হবে কিনা, বলো দোস্ত?

প্রথম জন বলল, সে তো হবেই। দু'দিন সবুর করে খতিয়ে দেখে যে-কোন কাজ করাই ভাল।

চতুর্থ জন বলল, আমার কাছে একটা রিপোর্ট আছে রূপচাঁদ, ওই সাধুটা দাগী আসামী, ঠগবাজ। বহু মানুষের মালকড়ি গহনা ঠকিয়ে লিয়ে পালিয়ে এসেছে। ওর বিরুদ্ধে খুন আর রেপ্ কেসের চার্জও আছে। ও শালা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বেড়াছে।

রূপচাঁদ বলল, তব্ তো আচ্ছা কর্‌কে ঠিক তরফসে খবর লিয়ে বড়বাবুকে ই ব্যাপারটা জানিয়ে দিলে কেমুন হয়? তুমরা সব ভেবে বলবা তো দোস্ত।

প্রথম জন বলল, দাঁড়া রূপচাঁদ, আগে ঠিকমতুন খবর নেওয়া যাক, তারপর দেখা যাবে।

রূপচাঁদ বলল, হামাদের কী অসুবিধা আছে? হামরা ফেয়ার কারবার করি। যেদিন উপরওয়ালা বারণ করবে, হামরা বেওসা বন্ধ করে দিব, দুসরা লাইন ধরব।

দ্বিতীয় জন বলল, সে তো ঠিকহ। আরে আমরা ইয়ংম্যান, দরকার হলে ঘাড়ে আলুর বস্তা বহে লিয়ে এসে বাজারে বসে বেচতে পারব। কিন্তুক উরা তো তা পারবে না।

রূপচাঁদ বলল, ঠিক বাত আছে। এ ভাইয়োঁ, হামরা সব দোস্ত মিলাকর্ একঠো আলুর কারবার করলে কেমুন হবে? ই বেওসা কবে বন্ধ হয়ে যাবে কে বলতে পারে! আখুন হামি শাদী করেছি। একঠো পারমেণ্ট বেওসা তো করা চাহি। হামি বলি কি আখুন একসাথমে বেওসা জুড়ে পরে সবাই আলাদা হয়ে যাবে। লেকিন হামাদের দল ঠিক থাকবে। আউর ইটাকে তখুন হামরা ব্যাকে দোনম্বরে ঠেলে দিব। তুমহাদের কী মত?

প্রথম জন বলল, ঠিকই বলেছিস রূপচাঁদ, একটা পারমানেণ্ট ব্যবসা করা দরকার। আখুন সবাই এক সাথে কারবার জুড়ে পরে যে যার কেপিটেল লিয়ে আলাদা হতে পারে। আলু একনম্বর, স্মাগলিং দো নম্বর। এই তো?

রূপচাঁদ বলল, হাঁ। হামি সেই কথা বলছি। লেকিন দুকানে তুমহাদের বসতে হবে, হামি তো ডোমের লেড়কা, হামি বসলে কুনো

আদমি মাল কিনবেনা। হামি আলুকা বস্তা আমদানি করার বেবোস্তা করব।

সকলেই একসঙ্গে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলল, ঠিক আছে, শুরু করে দাও।

দ্বিতীয় জন বলল, মন্দ নয়. দু'নম্বর কারবারকে দু'নম্বরে রাখাই ভাল। এক নম্বর ব্যবসা দাঁড়িয়ে গেলে তখন কারবারকে ভাগ করে যে যার আলাদা হয়ে যেতে পারব। কিন্তু ইউনিটি ঠিক রাখতে হবে।

তৃতীয় জন বলল, ঠিক আছে, সব কথা বুঝলাম : কিন্তু তার আগে সাধু আর সবকারকে খতম না-করলে তো আমাদের হাজতে যেতে হবে, ব্যবসা করে রাজা হবার স্বপ্ন উ শালারা ছুটিয়ে দিবে। ভেবে দেখ তোরা, উ শালারা গাঁজা হাসিশের কারবার করে মুঠো মুঠো টাকা লুটছে, মন্দিরে মাল রেখে ঠাকুর-দেবতাকে পয়মাল করছে, রূপচাঁদের বৌটাকে হাপিস করতে চাইছে, আর তোরা উ শালাদের বেমক্কা ছেড়ে দিয়ে আগে কারবার করতে চাইছিস। তা হবে না। আগে শালাদের খতম কর, তারপরে ব্যবসার কথা পরে ভাবা যাবে। তা না হলে উ শালারা আমাদের ব্যবসা লোপাট করবে, জানে খতম করবে। ক্যানে জানিস? উ শালারা আমাদের পালটা দুশমন।

চতুর্থ জন বলল, আমরা খারাপ সবাই জানে। কিন্তু মাইরি পয়লা নম্বর খোঁচর লোকেরা, খুনী লম্পট দাগী শালারা দুনিয়াতে সাধু সেজে ঘুরে বেড়াবে আর সব দোষ আমাদের ঘাড়ে চাপাবে, এটা মেনে লেওয়া যায় না। আমারও তাই মত, আগে উ শালাদের একটা ব্যবস্থা হোক, তারপর তোরা যা খুশী কর।

দ্বিতীয় জন বলল, তাহলে আগে ভাল মতন সাধুর সম্পর্কে খোঁজ লিয়ে কাজে নামতে হবে।

প্রথম জন বলল, তাছাড়া ঠাণ্ডা মাথায় বসে প্ল্যান লিয়ে তবে কাজে নামতে হবে।

রূপচাঁদ বলল, ইয়ে ঠিক বাত আছে। তা না হলে উ শালারা সুযোগ পেলে হামাদের লহু চুষে খাবে।

তৃতীয় জন বলল, যেদিন শুনলাম তোর বৌকে তুলতাই করতে চেয়েছিল সেদিন থেকে উ শালাদের ওপর আমার খার আছে। উ শালারা ফের দাঁও খুঁজবে। বুঝলিস্ রূপচাঁদ? তুই সাবধান হয়ে থাকিস।

দ্বিতীয় জন বলল. একটা কথা আমার মাথায় ঢুকছেনা, ওর বৌকে নিয়ে উরা কী করত ?

চতুর্থ জন বলল, ওর বৌটা তো সুন্দরী, মায়ের ভোগে তুলে দিত। বুঝলিস্ ?

প্রথম জন বলল, যাক, ছেড়ে দে, আর মুখ খারাপ করিস না। সাধু শালা তো শুনছি রেপ্-কেসের আসামী, খুন জখম, মালকড়ি লুটের চার্জও ওর বিরুদ্ধে আছে। ওকে খতমই করতে হবে।

তৃতীয় জন বলল, শোনা কথা নয়, আমার রিপোর্ট খাঁটি। তারপর রূপচাঁদের দিকে তাকিয়ে বলল, তোর বৌকে সাবধানে থাকতে বলিস, বুঝলিস ? আর ছুরি পিস্তল চালানো শিখিয়ে ওকে আমাদের দলে ভর্তি করে লে। দলে একটা মেয়েছেলে না-থাকলে ঠিক মানায় না মাইরি।

দ্বিতীয় জন বলল, হ্যাঁ, ছুরি-পিস্তল চালানো শিখে রাখা ভাল। বিপদে পড়লে তবু তো বাঁচতে পারবে। আমার মতে কি জানিস, স্কুল থেকে এসব জিনিস শিখানো খুব দরকার।

প্রথম জন বলল, রূপচাঁদের বৌ ছুরি-পিস্তল চালানো জানবে না, এটা খুব তাজ্জবের কথা !

রূপচাঁদ হেসে বলল, ধুস্! টগরের বহুত ডর লাগে। জানিস্ সেদিন ছুরিটা খালি ধরতে বললাম. তো এইসা নরম হাতে আল্‌তো করে ধরল, যে, মুনে হল একঠো কাঁচ্চা লেড়কাকে হাতে তুলে নিয়েছে, বেশী চেপে ধরলে যেন মরেই যাবে। ওকে দিয়ে ইসব কাম হবে না দোস্ত।

প্রথম জন বলল, হবে না কী ? হতেই হবে। তোর বৌ ছুরিকে ছেলের মতোই ভালবাসে, দেখিস তোর চেয়ে খুব ভাল ছুরি চালাতে পারবে। তবে তোকে আগে একটু শিখিয়ে দিতে হবে।

রূপচাঁদ বলল, তা দিতে পারি। তবে ওকে দিয়ে ইসব কাম হবে না মাইরি, সে হামি বুঝে লিয়েছি। হাঁ, রস্থই পাকানো বোলো, মাংস বোলো, দারুণ পাকাবে, সবকে যত্ন করে খাওয়াবে।

সকলেই প্রায় সমস্বরে বলে উঠল: তাহলে হোক একদিন রূপচাঁদ, কব্জি ডুবিয়ে খেয়ে আসি।

রূপচাঁদ বলল, লেকিন হামরা মুর্দাফরাস আছি, তুমহাদের জাত নষ্ট হবে না?

সকলেই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল: এসব কী কথা! কিসের জাত? আমবা সবাই মানুষ।

প্রথম জন বলল, এর মধ্যে আবার জাত-বেজাতের কী আছে? এই জন্যেই তো শালা দেশটা জাহান্নামে গেল।

রূপচাঁদ বলল, হামাকে মাফ করো, হামি অন্যায় বলে ফেলেছি।

দ্বিতীয় জন বলল, তোর বাড়িতে দু'মুঠো মাংস ভাত খাব, তো এর মধ্যে জাত এল কী করে?

তৃতীয় জন বলল, আরে না, এই কথা বলে ও কাটাতে চাইছে।

চতুর্থ জন বলল, তার চেয়ে বল্ বাপু খাওয়াব না, কিন্তু তাই বলে জাত তুলবি না। জাত বলে কিছু নাই। আমরা উসব মানি না। আমাদের সঙ্গে এতকাল ঘুরেও তোর একটুও জ্ঞানগম্যি হয়নি।

রূপচাঁদ বলল, আর না, হামি মাফ চেহে লিয়েছি। হামি মাংস-ভাত খাওয়াব তো বলছি।

* * *

পরদিন পুলিশ সারা শহর তোলপাড় করে প্রচুর পরিমাণে চোরাই মাল খুঁজে বার করল। নামীদামী লোকের ঘর থেকে এমন সব জিনিস পাওয়া গেল, যা দেখে পুলিশও থ। সম্মেলন কমিটির সদস্যদের ঘর থেকেই বেশী পরিমাণে চোরাই মাল, হাসিশ, হেরোইন, নানাধরণের আপত্তিকর জিনিস এবং কালো টাকা পাওয়া গেল। কিন্তু আশ্চর্যের ঘটনা, নন্দকিশোর সরকারের বাড়ি, মোকাম তল্লাশ করে কিছুই পাওয়া গেল না। পুলিশ শ্মশানে গিয়ে নন্দকিশোরের

কাঠের মোকামে হানা দিল। কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। পুলিশ যখন শ্মশানের কাঠগোলায় হানা দেয়, সাধুবাবা তখন মন্দিরের ভেতরে বসে সুর করে কালীকীর্তন গাইছিলেন। এইসব তুচ্ছ পার্থিব ঝঞ্ঝাট ঝামেলার দিকে তাঁর বিন্দুমাত্র নজর নাই। তিনি তখন ভাবের ঘোরে অন্য এক আনন্দলোকে বিরাজ করছিলেন। ওপর মহলের নির্দেশ ছাড়া স্থানীয় পুলিশ নিজের দায়িত্বে ধর্মস্থানে হানা দিতে সাহস করেনি। কারণ এখন যা দেশের অবস্থা তাতে এই কাজটা খুব সুবিবেচনার নয়। কোথা থেকে কী হয় বলা যায় না! পুলিশ সাধুবাবাকে তাই আর ঘাঁটায়নি।

পুলিশ রূপচাঁদের ঘরেও হানা দিল। তখন পদম, শুখরাম আর রূপচাঁদের সাঙাতেরা লাইন করে বসে সবাই একসঙ্গে মাংস-ভাত খাচ্ছে। টগর পরিবেশন করছে। দারোগাবাবু ঘরে ঢুকে মাংসের হাঁড়ি ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পেলেন না।

দারোগাবাবু বললেন, কীরে রূপচাঁদ, চোরাই পাঁঠা নাকি?

রূপচাঁদ খেতে খেতে বলল. এক পিস্ করে খেলেই ধরতে পারবেন স্যার।

দারোগাবাবু বললেন, উঃ! খুব কথা শিখেছিস তো! লাইনে থেকে চালু হয়ে গেছিস্।

রূপচাঁদ টগরের দিকে তাকিয়ে বলল, সবাইকে এক পিস্ করে মাংস খেতে দাও।

—দূর! ক্ষেপেছিস্ নাকি? তারপর টগরের দিকে তাকিয়ে দারোগাবাবু বললেন, হারামজাদা খুব শয়তান, এবার আমাকেই ফাঁসানোর ধান্দায় আছে। এবার একটু বেঁধে শাসন করিস বৌ, তা না হলে তোর কপালে দুর্গতি আছে।

টগর মাথা নিচু করে বলল, ইয়ে কাম তো আপ্‌লোগ কর্ সকতা হ্যায় না?

—আরে আমার শাসন তো কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে গিয়ে হাজতে চালান দেওয়া···

—ইস্‌কো শাসন নহী কহতা বাবু।

—তাহলে কাকে শাসন বলে রে?

—হুজুর গোস্তাকি মাফ করবেন। লেড়কাকে জানে মেরে কুনো বাপ শাসন করে না বাবু। এইসা শাসন করবেন যাতে লেড়কা আউর খারাপ কাম কভি নহী করে। তব্‌তো শাসন! নহী তো আপ্‌কো কেয়া ফয়দা?

দারোগাবাবু নিজের দলের দিকে তাকিয়ে বললেন, আই বাপ! এ তো আচ্ছা খাণ্ডারী মেয়ে বাবা! গড়গড় করে এক গাদা কথা শুনিয়ে দিল। তারপর রূপচাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, দারুণ বৌ রে!

রূপচাঁদ বলল, একটু মাংস খাবেন না স্যার? খেলে জাত যাবে না—

—চোপ্‌, হারামজাদা! তারপর নিজের দলের দিকে তাকিয়ে বললেন, চলো সবাই।

দারোগাবাবু সদলবলে চলে গেলেন। যাবার সময় টগরের দিকে তাকিয়ে একবার হাসলেন।

খাওয়া শেষ করে সকলেই উঠে পড়ল। পদম দোস্ত শুখরামকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে দুই বুড়ো এখন একটু বিশ্রাম করবে, কিছু গল্পগুজবও হবে। তাছাড়া মেয়ে-জামাইকে এখন একটু নিরিবিলি থাকতে দেওয়া ভাল। নতুন বিয়ে। ওদের মিলমিশ না হলে তো মুস্কিল। দোস্ত শুখরামও সে কথায় সায় দেয়। লেড়কা আউর বহুড়িকে এখন থোড়া হাসি তামাশা করতে না-দিলে এই বুড়ো দু'জন বড় লাচারে পড়ে যাবে।

পদম আর দোস্ত শুখরাম চলে গেলে রূপচাঁদের এক সাঙাত বলল, আঃ! কী চমৎকার যে খাওয়ালে বৌ, ভুলতে পারব না, যেন অমৃত খেলাম।

আর একজন বলল, সত্যি দারুণ! শোন বৌ, তুমি রূপচাঁদের বৌ, রূপচাঁদ হল আমাদের দোস্ত। বুঝলে কথাটা?

টগর বলল, জী, হাঁ।

—তাহলে তোমাকে সারাক্ষণ দোস্তের সঙ্গে থাকতে গেলে আমাদের দলের সঙ্গে যেতে হবে, ছুরি পিস্তল চালানো শিখতে হবে, শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে হবে। বুঝেছো ?

আর একজন বলল, আমরা তোমাকে ছুরি চালানো শিখিয়ে দিব।

টগর হেসে বলল, ইয়ে কেয়া বাত হ্যায় আপ্ লোঁগকো ?

—দেখো বাপু, উসব হিন্দিমে আমাদের সঙ্গে কথা বলবে না, খাঁটি এক নম্বরী বাংলায় বলবে। আমাদের লাইনের ভাষা তোমাকে শিখতে হবে। বুঝেছো ?

—ঠিক আছে, হামি শিখে লিবো। লেকিন ছুরি পিস্তল চালাতে পারব না।

—উঁহু। তাহলে চলবেনা, উটাও তুমাকে শিখতে হবে।

—আচ্ছা, একঠো বাত বলব ?

—বলো।

—মেয়েমানুষের হাতে কী ছুরি মানায় ? মেয়েমানুষের হাতে ছুরি তুলে দিলে সে তো পহেলে ঘরের আদমির বুকে ছুরি চালিয়ে পরখ করবে।

সকলেই হো হো করে হেসে উঠল।

একজন হাসি থামিয়ে বলল, শুনেছিস দোস্ত, তোর বৌ কী বলল ?

রূপচাঁদ বলল, কী করে শুনব, হামার বুকে তো ছুরি চালিয়ে দিয়েছে না!

আর একজন বলল, তা ঘরের আদমি তো তুমার শত্রু নয়। তুমি শত্রুকে মারবা।

টগর বলল, মেয়েমানুষের যদি অত দোস্ত আউর দুশমন জ্ঞান থাকত, তো এই দুনিয়া বদল হয়ে যেত।

অপর একজন বলল, নিজেকে অত অজ্ঞান ভেবো না। মেয়েমানুষ অজ্ঞান হয় না। ওরা মাঝে মধ্যে পুরুষদের চেয়েও বেশী জ্ঞান

রাখে। তুমি খুব চালু মেয়ে। বহু তকলিফ করে রূপচাঁদ তুমাকে এই ঘরে তুলে লিয়ে এসেছে। তা নিজেকে বাঁচানোর জন্যেও তো ছুরি ধরা দরকার।

আর একজন বলল, রাত বিরেতে আমাদের লাইনে যেতে হয়। রূপচাঁদ না-থাকলে তখন তুমাকে বাঁচাবে কে? ছুরি পিস্তল হাতে থাকলে তো দুশমনের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে পারবা। তাই না?

অন্য একজন বলল, আরে এই! তোরা তো সবাই বেশ এক পেট গিলে হাসি তামাশা গল্প জুড়েছিস। তা ও বেচারী এখনও কিছু খায়নি মুনে রেখেছিস কেউ? তারপর টগরের দিকে তাকিয়ে সে বলল, তুমি খেতে যাও তো, এদের কথায় কান দিয়ো না। মেয়ে-মানুষ খেটে রান্না করবে, যত্ন করে সবাইকে খাওয়াবে, আবার সময়মত দু'মুঠো খেতে পাবে না, এইজন্যেই তো শালা যত গোলমাল! যাও, খেয়ে লাওগা—

* *

শ্মশানে গভীর রাতের অন্ধকারে কাঠের মোকামের অন্দর কোঠায় আলোচনা চলছে। সাধুবাবা আর নন্দকিশোর সরকার। ঘরের চারপাশে চারজন পাহারা। হুলো হুপো ঢ্যাং চ্যাং। দু'একটা রাতচরা পাখির ডাক ছাড়া আশেপাশে কোথাও কোন জনমনিষ্যির সাড়া নাই।

নন্দকিশোর বললেন, ব্যাপারটা শুনেছেন? রূপচাঁদের দলই বোমা মেরেছে।

সাধুবাবা বললেন, হুঁ! ছোকরা খুব বেড়েছে! তুলে এনে একেবারে খতম করে দিন।

—সেটা খুব মুস্কিল। সব সময় দলবল নিয়ে ঘোরে। সকলের পকেটেই সব সময় বেআইনি রিভলবার থাকে। রাতেও রূপচাঁদ ঘরে থাকে না। তাছাড়া আমার দলের তেমুন জোর নাই, অস্ত্রশস্ত্র নাই, কী করে কাজ চলবে! তবে দুটো দিন থামেন, পুলিশকে প্রায় হাত করে এনেছি, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলব।

সাধুবাবা কী যেন ভাবলেন, বললেন, রাতে ও-ছোকরা ঘরে থাকে না? তাহলে তো আপনার কাজের পক্ষে খুব সুবিধা। ভেবে দেখুন, সামনে কৃষ্ণপক্ষ, মঙ্গলবার, অমাবস্যার রাত!

—ঠিক আছে বাবাঠাকুর, তাহলে তো আমার তাবিজটা সেদিন রাতেই হয়ে যাবে।

—সেই কথাই তো বলছি। আর রূপচাঁদকে কী করে জব্দ করা যায় ভাবুন।

—কিছু বেআইনি অস্ত্র জোগাড় করতে হবে, আরও লোক আনতে হবে, আর ওদিকে পুলিশকেও হাতে রাখতে হবে। সাঁড়াশি দিয়ে না-ধরলে ওকে জব্দ করা যাবে না। তাছাড়া আমাকে এমনিতে সব জোগাড় রাখতে হবে। কারণ এ-সপ্তাহেই আমার ফের গাঁজা-হাসিশ আসছে, কারবার ফের পুরোদমে চলবে। ওপর মহলের সঙ্গে একটা রফা হয়ে গেলে তো কিছু চোরাই মালও রাখব। সভা কমিটির যেসব সদস্যদের ঘর থেকে মাল বেরিয়েছিল, তারা সবাই ম্যানেজ করে কারবার জুড়ে দিয়েছে। আমাকেও তা করতে হবে। ইদিকে ভাবছি কাঠের কারবারটা আরও বাড়াব, আটা-ময়দার হোল-সেল কারবারও করব। আমাকে শুধু পাশে থেকে মায়ের আশীর্বাদ পাইয়ে দিবেন।

—সেজন্যে তো আমাকে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হবে। তারপর আমার কিছু নন্দিভৃঙ্গি চাই। আপনার হুলো হুপোদের সেই ভাবে আমার পাশে থাকতে বলবেন। কিন্তু ভৈরবী? আমার ভৈরবী চক্রেরই বা কী ব্যবস্থা হবে? অনেক কিছু ভাবার আছে। এখানে সে পথে বাধা ঘটলে সাধনার জন্যেই আমাকে অন্য জায়গা খুঁজতে হবে।

—না, না, ইখানেই সব ব্যবস্থা হবে। আগে আমার তাবিজের ব্যবস্থা করেন, তবে তো মনে জোর পাব। আর আমার বৌয়ের ছেলেপিলে হচ্ছে না ক্যানে? কিছু গাছ-গাছড়ার ওষুধ দিবার ব্যবস্থা করেন। যত টাকা লাগে, তা ঢালব। কত টাকা তো ঢাললাম, কত

ডাক্তার-বদ্যি ফেল মেরে গেল। মনে যে আমার বড় অশান্তি বাবা-ঠাকুর। শুয়ে বসে খেয়ে ঘুমিয়ে শান্তি নাই। বুকের মধ্যে তুষের আগুন অহরহ জ্বলে।

—পাবেন, শান্তি পাবেন। কিছু হোম যজ্ঞ করতে হবে, আমাকে নির্জন সাধনায় বসতে হবে। অমাবস্যার নিশিরাত হলে সবচেয়ে ভাল। তবে একসাথে দুটো কাজ হবে না। আগে আপনাব গ্রহ শান্তির জন্যে তাবিজটা তো বানিয়ে দিই, তারপরে ওটা ভাবব। চিন্তা করবেন না, সিদ্ধিলাভ হবেই।

—জয় হোক বাবাঠাকুর! আমি আপনার সব ব্যবস্থা করব। এখন আপনার ভক্ত শিষ্য অনেক বেড়েছে। ভৈরবীও হবে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন বাবাঠাকুর, আমিই আপনার প্রথম লোক। আমিই আপনাকে এখানে পথ দেখিয়েছি। আমদানি আবিষ্কার লোকে যা-খুশী বলুক, আমি আপনাকে এই পীঠস্থানে বসতে সাহায্য করেছি। আমার জন্যেই আজ আপনার এত রবরবা। ফলে আমাকে বাঁচিয়ে আপনি যা খুশী করেন, আমার আপত্তি নাই। আমাকে সব রকম বিপদ-আপদ অশান্তি থেকে রক্ষা করলে আমিও আপনার সব কাজে সাহায্য করব। কিন্তু এমন কিছু কাজ যেন না-ঘটে যাতে আমি বিপদে পড়ি। এই দিকটা লক্ষ্য রাখবেন বাবাঠাকুর।

—দুষ্ট গ্রহ আপনাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে বলেই এরকম চিন্তা আপনার মাথায় এল।

—তা হতে পারে। তবে সেটাকে শান্ত করা তো আপনারই কর্তব্য।

সাধুবাবা আড়চোখে একবার নন্দকিশোরকে আপাদমস্তক দেখলেন, তারপর বললেন, সাধুসন্ত সম্পর্কে মনের মধ্যে কোন সন্দেহ রাখবেন না, পাঁচ কথায় কান দেবেন না, তাতে পাপ হয়। আর সেই পাপেই জীবের পতন ঘটে।

—তাহলে কী উপায়?

—উপায় ধর্মে বিশ্বাস, কর্মে বিশ্বাস, সাধুর ওপরে বিশ্বাস, ঈশ্বরে

বিশ্বাস। এছাড়া বাঁচার অন্য কোন পথ নাই। একালে কিছু লোক সাধুর ওপর সমস্ত দুষ্কর্মের বোঝা চাপিয়ে নিজেরা সাধু সাজতে চায়। তাতেই যত দুর্গতি। সাধু যে, সে সাধুই থাকে। প্রকৃত সাধুর নামে শত অপপ্রচার করলেও তাকে চোর বানানো যায় না। সুতরাং আমার ওপরে বিশ্বাস রেখে চলুন, জীবনে উন্নতি হবে। তবে আপনিও মনে রাখবেন, যেদিন আপনার মনের কোণে কোনরকম অবিশ্বাসের বীজ জন্ম নেবে সেদিনই দেখবেন সাধু অন্তর্ধান হয়ে গেছে। ভুলেও এমন কাজ করবেন না।

—এত কথা বলছি তার কারণ হল, এরপর তো আমি অনেক রকম ব্যবসা বাড়িয়ে ফেলব বলে মনস্থ করেছি। তখন তো আপনার সব কাজে খোঁজ খবর রাখতে পারব না। আমার সাহায্য পাবেন, আপনার পাশে আমার লোকজন থাকবে, কিন্তু ভালমন্দ বিচার করে সব কাজ আপনাকেই করতে হবে। আমি সময় পেলেই মাঝে মধ্যে এসে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করব।

—তাতেই হবে। আমার সবচেয়ে বড় দরকার হল আমার ওপরে আপনার বিশ্বাস।

—সেটা তো আছে বলেই আপনাকে এতদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি, আমারও উন্নতি হচ্ছে।

—ব্যস্! আর আমার কিছু চাই না। মনে রাখবেন, আমার ওপর সেই বিশ্বাস যার থাকবে না তার পতন অনিবার্য। আমার কথা ভবিষ্যতে খাঁটি কিনা তা অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে নেবেন।

—আপনার ওপর বিশ্বাস না-রাখলে আমার সব কিছু তো অচল হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আজ তাহলে উঠি বাবাঠাকুর। জয় হোক।

* * *

পরদিন থেকেই সাধুবাবা সাধনায় বসলেন। নন্দকিশোর সরকার পদমকে ডেকে বললেন, বাবাঠাকুর কর গুণে বলেছেন, দেশে মড়ক লাগবে। ইদিকে তো আমি আটা-ময়দার কারবার জুড়েছি, উদিকে কাঠের ব্যবসা। আমার তো এক ছিটা সময় নাই। মড়ক লাগলে

শ্মশানের কাজ বাড়বে, তখন তোকেই সব কিছু দেখাশুনা করতে হবে, শ্মশানে কাঠ বিক্রির টাকা-পয়সার হিসাব তোকেই রাখতে হবে। আমি মাঝে মধ্যে আসব।

—না বাবুসাব, এতবড় ঝক্কি হামার ওপর চাপাবেন না। হামি তো আপনার কাছে দেনদার আছি। কুথায় কোন হিসাবে গোলমাল হয়ে যাবে, তখুন হামার দেনা ভি বেড়ে যাবে।

—আরে উসব কথা রাখতো। তুই আমার বিশ্বাসী লোক, তা হবে না। একবার কুথায় কী হয়েছে বলে বারবার হবে নাকি? ইখানে এখুন থেকে মন দিয়ে কাজ করলে তোর দেনা শোধ হয়ে যাবে, বহু টাকা তোর আয় হবে। কাজ বাড়লে তো তোর আমার সবারই হাতে দুটো পয়সা আসবে। তাছাড়া ভেবে দেখলাম এটা তোদেরই জাত ব্যবসা, তোর ওপরেই সব দাযিত্ব থাকা ভাল। আমার শুধু পিছনে টাকা খাটবে।

—হামার জামাই, দোস্ত শুখরাম সব্বাই হামাকে ইসব কাম ছেড়ে দিতে বলছে। তো হামি ঠিক করেছি ইসব কাম হামি আর করব না বাবু।

—সে কী রে। তাহলে তোদের পেট চলবে কী করে? এক জামাইযের রোজগারে চার চারটে পোষ্য, ভবিষ্যতে আরও বাড়তে পারে। ওই বেচারা জামাইযের ওপর এত চাপ দেওয়া কি তোদের উচিত হবে? তাছাড়া এটাই তোদের জাত-ধর্মের কাজ। ছেড়ে দিলে তোর গুনাহ হবে না? এই যে তোর দোস্ত শুখরাম রাগ করে কাজ ছেড়ে দিয়ে এখুন কেমুন ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছে। কাজ করার ক্ষমতা তো আর তেমুন নাই. তার উপরে দেহে একরাজ্যের রোগ পুরে কষ্ট পাচ্ছে না?

—হাঁ বাবু, বাত, হাঁফের টান, বুকের দোষ, বহুত তকলিফ পায় দোস্ত।

—এ হল সেই গুনাহের ফল। তুই ককৃখনো এমুন ভুল করিস না। তাছাড়া বেশী চাপ দিলে তোর জামাই ফসকে যাবে, তোরও

উচিত হবে না। বরং কাজকাম কর, দু'চার বছরেই তোর মেয়ে-জামাইকে পাকা বাড়ি বানিয়ে দিতে পারবি। তুই শক্ত সমর্থ মানুষ, জামাইয়ের ওপর বসে খাবি ক্যানে? এমন আহাম্মকি কেউ করে নাকি? নিজের হাত থাকতে পরের দয়ায় কেউ কি বসে বসে খায়?

পদম হা করে নন্দকিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল। সে এসব কথার কোন জবাব দিতে পারল না। নন্দকিশোরের অকাট্য যুক্তির ধারে ভারে সে কাবু হয়ে পড়ল।

নন্দকিশোর বললেন, কী, একটা কিছু জবাব দে? এই দোষেই তো তোদের কপালে দুঃখ, পেটে ভাত জুটে না। আরে বাপু, না-খাটলে তোকে কে খাওয়াবে চিরকাল? শুখরাম প্রায় অক্ষম, বেটার রোজগার খাবার তবু একটা ওর অধিকার আছে। কিন্তু তোর? মুখে তো বললে হবে না, দুদিন বসে বসে খাওয়াবে, তৃতীয় দিনে তোর পথ তোকেই খুঁজে লিতে হবে। তাছাড়া একরকম অপদার্থ না-হলে এই কুকর্ম কেউ করে নাকি? তোর নিজের একটা সম্মান নাই? ক্যানে বসে বসে তুই মেয়ে-জামাইয়ের ভাত ধ্বংস করবি! নিজে স্বাধীন ভাবে খেটে খেলে তবেই না তোর হিম্মত!

পদম বলল, এ তো ঠিক বাত বাবু।

নন্দকিশোর বললেন, তাহলে ঠিক আছে. তুই কাজ করবি কথা দিলি তো?

পদম শুধু নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে নন্দকিশোরকে কথা দিয়ে গেল।

পদম চলে গেলে নন্দকিশোর হুলো আর ঢ্যাং দু'জনকেই ডেকে পাঠালেন। ওরা দুজনেই নন্দকিশোরের সামনে এসে হাজির হল। নন্দকিশোর হুলো আর ঢ্যাঙের ওপর হালকা কাজের দায়িত্ব দেবেন স্থির করেছেন। তিনি বললেন, তোদের কী কাজ বুঝে লিয়েছিস তো? তোদের কাজ হল আটার সঙ্গে জোয়ার বাজরা ভুট্টা তেঁতুলবিচি আর দু'একটা ধুতরা ফলের বিচি একসাথে পেষাই করে এমন ভাবে মিশেল দিতে হবে, যাতে সস্তায় গরিব দুঃখী রুটি খেয়ে বাঁচতে পারে।

ওরা অনুগত খাদেমের মত ঘাড় নেড়ে চলে গেল।

এবার তিনি ডেকে পাঠালেন হুপো আর চ্যাঙকে। তিনি ওদের ডেকে গোপনে ফিসফিস ক'রে কী বললেন তা কাকপক্ষীতেও টের পেলনা।

নন্দকিশোরের আরও চারজন নতুন লোক এল। তারা শুধু গাঁজা, হাসিশ, চোরাই মাল আমদানি ও পাচারের কাজে থাকবে। বহু কষ্টে সরকার মশাই গোটা দুয়েক বেআইনি পিস্তলও জোগাড় করে কিনে ফেললেন। যদি বিপক্ষ দলের সঙ্গে কখনও লড়াই করতে হয়, তখন একমাত্র একঠাং-ওয়ালা হুলো বাদে সপ্তরথী সবাই এক সঙ্গেই যাতে লড়তে পারে। সবই ঠিক করা হল। শুধু তাই নয়, দিনকয়েক ধরে এই সপ্তরথী কিভাবে লড়বে তারও মহড়া দেওয়া হল।

নন্দকিশোর সরকার অনেকটা কাজ গুছিয়ে ফেললেন। পাড়ার ক্লাব আর ভোট-পার্টির দলকে ডেকে ডেকে চাঁদা দিতে লাগলেন। এরপর ব্যবসায়ী মহল, পুলিশ, ওপর মহলের অফিসার, পাড়ার মাস্তান, সাধুবাবা থেকে শুরু করে ঘরের স্ত্রী পর্যন্ত সবাইকে তুষ্ট কিম্বা বশ করে যেভাবেই হোক হাতের মুঠোয় এনে চলতে হবে। এর নাম জীবন। এরই নাম সুস্থ ভাবে নাম-প্রতিপত্তি নিয়ে শিরদাঁড়া খাড়া রেখে বেঁচে থাকা। যারা পারে না, শুধু মুখেই লম্বা-চওড়া বক্তৃতা ঝেড়ে সাধুতা ফলায়, তাদেরকে লোকে ভোঁদা বা ভোলটু বলে। নন্দকিশোর সরকার সব বুঝে ফেলেছেন এবং এই যুগকে বেশ চিনে ফেলেছেন। নিজে বাঁচলে বাপের নাম!

কয়েকদিন পর লোকমুখে জানা গেল গোবিন্দর সোমত্ত মেয়েটাকে সন্ধ্যে থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সারারাত পাত্তা নাই। পরদিন ভোরে আলুথালু পোশাকে যদিও বা নিজেই পায়ে হেঁটে ফিরে এল, কিন্তু মুখে তার কোন রা নাই। চোখেমুখে কেমন যেন একটা বেপরোয়া ভাব, রাত্রি জাগরণের চিহ্নও সুস্পষ্ট। ঘটনা কিছুই জানা গেল না। পাঁচজনের পরামর্শে সাধুবাবার জলপড়া আর গাছ-গাছড়ার ওষুধ নিয়ে এল গোবিন্দর বৌ। গোবিন্দ ডাক্তার ডেকে নিয়ে এল। মেয়ে কিছুটা সুস্থ হল বটে, কিন্তু ভেঙে কিছুই

বলল না। গোবিন্দর বৌয়ের বিশ্বাস হল সাধুবাবার জলপড়ায় কিছুটা কাজ দিয়েছে। সে সাধুবাবার দুয়োরে রোজ ধর্না দিতে শুরু করল। দেখাদেখি পাড়ার বহু মেয়ে-পুরুষ সাধুবাবার কাছে নানা আধি-ব্যাধির ওষুধ নিতে ছুটল। মাদুলি আর শিকড়-বাকড়ে বহু দুরারোগ্য ব্যাধিও নাকি সেরে যেতে লাগল। সাধুবাবার অলৌকিক মাহাত্ম্যের কথা দিকে দিকে প্রচার হয়ে গেল। নিন্দুকেরা গোত্তা খেয়ে চুপ মেরে গেল। ধর্ম-মহাসম্মেলনের যেটুকু ঘাটতি ছিল, এবার তা পূরণ হয়ে গেল। পরমার্থের লোভে মায়ের মন্দিরে সাধুবাবার চরণে মানুষ জলের মত অর্থ ঢালতে লাগল।

নন্দকিশোর সরকারের মুখে হাসি ফুটল। কারণ সাধুবাবা তাঁকে ধারণ করার জন্য সেই দুর্লভ তাবিজ দিয়েছেন। তাবিজ ধারণ করার পর থেকেই তাঁর কারবার দশগুণ বেড়েছে। রাতের অন্ধকারে গাঁজা, হাসিশ আর হরেক কিসিমেব চোরাই মাল আমদানি রপ্তানি হচ্ছে। একদিকে যেমন আটা-ময়দার কারবার চলছে, অন্যদিকে তেমনি মড়ক এ-পর্যন্ত না-লাগলেও শ্মশানের কাজ বেড়েছে, কাঠের বিক্রি বেড়েছে।

এখন শ্মশানে দু'বেলা হরদম মড়া আসছে। পদম একা এত কাজের চাপে দু'বেলা খুব হাঁপিয়ে উঠছে। সব কাজ সেরে উঠতে পারছে না। ফলে সে বাধ্য হয়েই দোস্ত শুখরামকে হাতে পায়ে ধরে শ্মশানে নিয়ে এসেছে। পদমের বড় তকলিফ হচ্ছে দেখে দোস্ত শুখরামও রুগ্ণ দেহে পদমকে সাহায্য করতে এসেছে। তাছাড়া এটাই তো ওদের জাত-ধর্মের কাজ। ওরা মুর্দাফরাস। নন্দকিশোর ওদের ওপর যত অবিচার আর জবরদস্তি এতকাল করেছে, তার বদলা নন্দ-কিশোরের ওপরেই নিতে হবে। কিন্তু মানুষের চরম বিপদের দিনে পাশে না-দাঁড়ালে একদিকে ওদের গুনাহ হবে, অন্যদিকে নন্দ-কিশোরের পরিবর্তে সেই রাগের বদলা সাধারণ মানুষের ওপরই নেওয়া হয়ে যাবে। সেটাও গুনাহ বটে! সুতরাং সাতপাঁচ ভেবে মাথা ঠাণ্ডা রেখে ওরা দু'জনেই এখন শ্মশানের কাজে লেগেছে। কিন্তু ওরা দু'জনেই হিমসিম খাচ্ছে, অষ্টপ্রহর খেটেও সব কাজ শেষ করতে

পারছে না। তবে সন্ধ্যেবেলা ওরা তু'জনেই ঘরে ফিরে আসে। তার কারণ, প্রায় রাতেই রূপচাঁদ ঘরে থাকে না। টগর একা ঘরে থাকতে ভয় পায়। রূপচাঁদকে নাকি লাইনের কাজে যেতে হয়। ফলে পদমকে বাধ্য হয়েই ঘরে পাহারা থাকতে হয়। তাছাড়া হুলো হুপোরাও চায় না সন্ধ্যের পর ওরা শ্মশানে হাজির থেকে কাজকর্ম করুক। বরং সন্ধ্যের পর হুলো হুপোরা ওদেরকে শ্মশান থেকে চলে যেতেই বলে। এটা ওদের কাছে প্রায় তাড়ানোর মতই মনে হয়।

রাতের শ্মশান বড় রহস্যময়। পদম ও শুখরাম খোঁজখবর নিয়ে কিছুটা রহস্য উদ্ঘাটন করেছে। মন্দিরের ভেতরে সাধুবাবা কী করেন তা এখনও জানা যায়নি। শোনা যায় তিনি নাকি যোগ সাধনায় মগ্ন থাকেন। বাইরে শ্মশান চত্বরে হুলো ও হুপো ডোম সেজে দাঁড়িয়ে থাকে। আর ঢ্যাং, চ্যাং ও নতুন চারজন প্রেত সেজে ঝোপে-ঝাড়ে লুকিয়ে থাকে। রাতে যেসব মড়া শ্মশানে আসে, প্রেতরূপী ঢ্যাং চ্যাঙেরা শবযাত্রীদের ভয় দেখায়। শবযাত্রীরা সংখ্যায় কম থাকলে জোর জুলুম চালায়। এইভাবে নানা কৌশলে শবযাত্রীদের কাছ থেকে বহু টাকা আদায় করে। রাত্রিবেলা, শ্মশান এলাকা লোকালয় থেকে বহুদূর। শবযাত্রীরা দেহে-মনে তুর্বল থাকে। ফলে ভয় পেলে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের অজুহাতে টাকা জমা পড়ে ডোমেদের হাতে কিম্বা মন্দিরের তুয়োরে, আর প্রেতেরা নেপথ্যে থাকে, সেখান থেকেই তাদের অভিনয় চলে। শবযাত্রীরা সংখ্যায় অল্প হলে এবং সহজে টাকা আদায় না-হলে জুলুমবাজি চলে। কিন্তু শবযাত্রীরা সংখ্যায় খুব বেশী থাকলেই প্রেতেরা জব্দ থাকে। তখন কাঠের দাম দ্বিগুণ বেড়ে যায় এবং সব শেষে হাত পেতে মোটা টাকা বকশিস আদায় করা হয়। ছলে বলে কৌশলে রাত্রির শ্মশানে টাকার খেলা চলে। তুর্গত মানুষের নাভিশ্বাস ওঠে, কিন্তু শোকার্ত শবযাত্রীরা এসব নিয়ে পরে আর মাথা ঘামায় না। তাছাড়া এই ঘটনা যে নিয়মিত প্রতিদিনই ঘটে, তাও নয়। সুযোগ পেলে তবেই ঘটনা ঘটে।

পদম ও দোস্ত শুখরাম এসব ঘটনা জেনে ফেলেছে। ওরা আরও

জানে, এইভাবে যে টাকা আসে তা মোকামের খাতায় জমা পড়ে না। কিন্তু ওরা ভয়ে কোন প্রতিবাদ করতে পারে না। কারণ, হুপোরা বলেছে, এসব নিয়ে ঝামেলা পাকালে কিম্বা কোনরকম ভাবে এসব জানাজানি হলে ছ'জনকেই মায়ের ভোগে তুলে দেওয়া হবে। তবু ওরা স্থির করেছে, সুযোগ পেলে কথাটা নন্দকিশোরের কানে একবার তোলা দরকার।

কিন্তু পরে পদম মত বদল করেছে, শুখরামকে বলেছে, হাম-লোগকা কেয়া ফয়দা হ্যায় দোস্ত ?

শুখরাম বলেছে, লেকিন ইয়ে তো বহুত খারাপ কাম হ্যায় না ?

পদম বলেছে, ইসকা পিছে বাবুকো মদত হ্যায় কি নহী, কৌন্ মালুম।

শুখরাম বুঝেছে এটাও তো ঠিক কথা। রাতে যেসব লোক শব-দাহ করার জন্য শ্মশানে আসে তারা ভয়ে বা বাধ্য হয়ে টাকা দেয়। নন্দকিশোর এইসব বুনো জন্তু পোষার খরচ কমানোর জন্য ওদের এইভাবে লেলিয়ে দিয়েছেন কিনা কে জানে। তাছাড়া শহরের মানুষও এসব নিয়ে এ-পর্যন্ত কোন হাঙ্গামা করেনি। ফলে ওদের কী দরকার ? এসব ঝট-ঝামেলার ভেতরে নিজেদের বিপদ ডেকে এনে কী লাভ হবে !

শুখরাম বলেছে, ইয়ে তো ঠিক বাত হ্যায়, লেকিম আদমি তো ভাবতে পারে ইস্‌কা পিছে ডোমেরা আছে। সব জেনেশুনে হামাদের চুপচাপ থাকা কি খুব ভাল কাম হছে ভাইয়া ?

—তব্ এক কাম করো দোস্ত, বেটা রূপচাঁদকো সব খবর শুনা দো।

—বহুত আচ্ছা, ইয়ে ঠিক মতলব হ্যায়।

ওরা ছ'জনেই একদিন ব্যাপারটা রূপচাঁদকে জানাল। রূপচাঁদ সব কথা শুনে একটু হাসল, বলল, ঘাবড়াইয়ে মাৎ, উসব জলদি ঠাণ্ডা হো যায়েগা।

এদিকে নন্দকিশোর চারপাশে চরকির মত ঘুরছেন। কিন্তু তবুও তিনি সমস্ত কাজ শুধু তদারক করে শেষ করতে পারছেন না। ফলে

তিনি এবার একটা মোটর সাইকেল কিনে ফেললেন। এখন ভোট-পার্টি থেকে মাস্তান পর্যন্ত সবই তাঁর হাতের মুঠোয়। নন্দকিশোর শহরের ভেতর দিয়ে ঘাড় উঁচু করে যখন দ্রুতবেগে ভট্‌ভটি চালিয়ে যান, তখন নিন্দুক আর নেড়ীকুত্তারা ভয়ে রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়ায়। মোসাহেব আর চাটুকারেরা হাত তুলে নমস্কার জানায়। নন্দকিশোর দেখেও সবাইকে দেখতে পান না। এখন নন্দকিশোরের বারোমাসই পৌষমাস। ফলে তাঁর গলার ও গায়ের তেজ আগের তুলনায় দিন দিন অনেক বেড়ে যেতে লাগল। তাঁর মান খাতির প্রভাব-প্রতিপত্তি উঁচু পর্দায় উঠতে লাগল।

শুধু বিপদ ঘটল ঘরে। নন্দকিশোর সাধুবাবার তাবিজ এনে যেমন নিজে ধারণ করেছেন এবং জীবনে পরখ করে দেখেছেন, ঠিক তেমনি স্ত্রীর জন্যেও আর একটি তাবিজ নিয়ে এসেছেন। নন্দকিশোর তাবিজের গুণাগুণ বুঝেছেন বলেই কিছুদিন বাদে স্ত্রীর জন্যেও তাবিজ আনতে সাহস ও উৎসাহ পেয়েছেন। কিন্তু এইখানেই যত গোলমাল ঘটল। সাধুবাবার তন্ত্রমন্ত্র তাবিজ কবচ ঝাড়ফুঁক তুকতাক কোথায় রসাতলে তলিয়ে গেল! নন্দকিশোরের ধারণা ছিল এইসব অলৌকিক মাহাত্ম্যের প্রভাব পুরুষের চেয়ে মেয়েদের ওপরই বেশী বিস্তার লাভ করতে পারে। চারপাশে তাকিয়ে নন্দকিশোর এখনও তা দেখতে পাচ্ছেন। অথচ নিজের ঘরেই যে এই ব্যাপারটা উল্‌টো ফল দেবে তা কে জানত! অন্তত নন্দকিশোর তা বুঝতে পারেন নি।

সাধুবাবার তাবিজ এনে নন্দকিশোর যেই স্ত্রীর হাতে দিলেন, অমনি সে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল, প্রায় মারমুখী হয়ে বলল, কিসের তাবিজ? সাধুবাবার? ঝেঁটিয়ে তুমার ওই সাধুবাবার বিষ ঝেড়ে নামিয়ে দিব। ফের যদি তুমি ওই শ্মশানে গিয়েছো আর ওখানকাব কাঠের কারবার বন্ধ না-করেছো, তো তুমার একদিন কি আমার একদিন! ই আমি সিধা কথা বলে দিছি জেনে রাখবা।

নন্দকিশোর আমতা আমতা করে বললেন, ক্যানে গো, সাধুবাবার তাবিজে তো পাঁচজনের কাজ হছে, আমিও ফল পেয়েছি।

—ফল পেয়েছো ? বলতে লজ্জা করেনা ? তুমার কপালে এখনও অনেক ফল পেতে বাকি আছে। ভাগ্যি, আমার বাবা আজও বেঁচে আছে বলে তুমার ভাঙা বাড়িখান দু'তলা হল, জমি হল, কারঁবার হল, সবই আমার বাপ-ভায়েদের টাকায়, এখুনো তুমার টাকার মুখ দেখিনি। আমি কি তুমার টাকার পরোয়া করি ?

—আমি কি কিছু অস্বীকার যেছি ? তুমার জন্যেই তো আমার কপাল ফিরেছে। আর এখুন থেকে আমার টাকার মুখ দেখতে পাবা, তাবিজ লিবার পর থেকেই তো রমারম টাকা আসছে।

—আসুকগা তুমার টাকা, আমার অমুন টাকার দরকার নাই। একটা কথা বলে দিছি শুনে রাখো, এখুন থেকে তুমি যদি সিধা রাস্তায় না-চলো তো তুমার সঙ্গে আমার একদিন বুঝাপড়া হয়ে যাবে।

—তুমার কথামতুনই চলবো। তা বলছিলাম কি এই তাবিজটা ধারণ করতে ক্ষতি কি ?

—ক্ষতি কী ? ক্যানে, সব কথা জানো না ? পাঁচজনে যখুন সাধু-বাবার কীত্তির কথা জানবে, তখুন তুমিও মরবা বলে দিলাম। আমি গোবিন্দর মেয়েকে ডেকে এনে সব কথা শুনেছি। সে ছুঁড়ি উয়ার মাকেও সব কথা খুলে বলেনি। ছুঁড়িরও দোষ আছে তা মানি। কিন্তুক তাই বলে তো আমরা জেনেশুনে একটা মেয়েকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিতে পারি না। তা গোবিন্দকে ডেকে আমি বলেছি যত টাকা লাগে আমি দিব, একটা পাত্তর খুঁজে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও।

—ই কথাটা মুন্দ বলোনি, আমারও তাই মত। তা গোবিন্দ কী বললে ?

—কী বলবে ? গোবিন্দ গরিব মানুষ, আমাদের কর্মচারী, তাই সে আখুনো আমাদের মুখ তাকিয়ে সব কথা চেপে আছে। বাপ্‌রে বাপ ! এই কীত্তির কথা রটলে শুধু মানুষ লয়, কুকুর শিয়ালে তুমাকে ছিঁড়ে খাবে। তুমার সাধু দেশটাকে একেবারে উচ্ছন্নে দিল। ক্যানে, পুলিশকে জানাতে পারছ না ? পুলিশ তো তুমার হাতে। তুমি না-জানালে আমিই একদিন পুলিশকে সব ফাঁস ক'রে ব'লে দিয়ে আসব।

আর তুমাকেও ব'লে দিছি খবরদার ওই সাধুর কাছে যাবানা, শ্মশান মুখো হবানা। কানে ঢুকল কথাটা ?

নন্দকিশোর বললেন, উদিকে তো যাওয়া ছেড়েই দিয়েছি। আর শ্মশানের কাঠের কারবার তো ডোমেদের হাতেই ছেড়ে দিয়ে এসেছি। তুমি বলার আগেই নিজের ভুল বুঝেই তো সাধুসঙ্গও ছেড়েছি।

এই কথা শোনার পর নন্দকিশোরের স্ত্রী কিছুটা শান্ত হয়ে বাক্যবাণ আপাতত স্থগিত রাখল। কিন্তু নিভন্ত উনুনের উত্তাপের মত তার কথার ঝাঁজ আরও কিছুদিন বজায় রইল।

নন্দকিশোর স্ত্রীর এইসব কথাবার্তা শুনে যদিও একটু ঘাবড়ে গেলেন, তবুও পরমুহূর্তেই তিনি ভাবলেন মেয়েমানুষের কথায় কান দিলে কাজ চলেনা। অগাধ সম্পত্তি আর টাকা দিতে পারলেই মেয়েমানুষের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। ওর বাপের টাকার জন্যেই তো এত কথা, ওর এত গরম। যেমন করেই হোক ওর বাপের চেয়েও বেশী টাকার মালিক নন্দকিশোরকে হতেই হবে। এবং এ-বিষয়ে এখন আর কোন সন্দেহই নাই, যেভাবে চারপাশ থেকে দু'হাতে টাকা আসছে তাতে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ঈপ্সিত জায়গায় গিয়ে তিনি পৌঁছাতে পারবেন। তখন নন্দকিশোরকে আর পায় কে ! এসব ভেবে তিনি নিজের মনেই বেশ তৃপ্তি বোধ করলেন।

কিন্তু নন্দকিশোরের মনে কোথায় যেন একটা খোঁচ বিঁধে আছে। তাঁর বারবার মনে হচ্ছে এতকাল ধরে তিনি যেসব কাজ করে এসেছেন বা যে-পথে হেঁটে চলেছেন, তা বোধ হয় ঠিক নয়। ওঁর স্ত্রী বোধ হয় মঙ্গলের জন্যেই ওঁকে সাবধান করতে চেয়েছে। টাকা তো সবচেয়ে বড় কথা নয়, টাকার চেয়ে জীবন অনেক বড়। সুতরাং একটু খতিয়ে ভাবলে এর মধ্যে খুব বেশী উল্লাসের কারণ কিছু নাই। এইভাবে চললে কোথাও কি একটা আচমকা কিছু ঘটেও যেতে পারে ! ফলে সাবধানে চলাই ভাল।

নন্দকিশোর শুনেছেন তন্ত্রমন্ত্রে নাকি অসাধ্য সাধন করা যায়। যদি তা-ই হয়, তাহলে তন্ত্রমন্ত্রের এই তাবিজ গ্রহণের পর ঘরের অশান্তি

বাড়ল কেন? সেদিনকার পুঁচকে ছোঁড়া রূপচাঁদ, তার দলের সবাই একই মাপের ফচ্‌কে! নন্দকিশোরের বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাতে সাহস পায়? নন্দকিশোরের ঘাঁটি দখল করে ওঁকে ফাঁসিয়ে দিতে চায়! তাবিজে আবার হিতে বিপরীত হল নাকি! ওঁর স্ত্রী তাবিজ না-নিয়ে হয়ত ভালই করেছে। নন্দকিশোরও এটা গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে আসবেন। তাছাড়া নন্দকিশোর আরও লক্ষ্য করেছেন সাধুবাবার আচরণ ইদানীং বদলে যাচ্ছে। তিনি খবর পেয়েছেন তন্ত্র সাধনার নামে বেশ কিছুদিন যাবৎ সাধুবাবা সারারাত মন্দিরের দরজা এঁটে ঘরের ভেতরেই থাকেন। তিনি ঠিক কী করেন, তা এখনও জানা যায়নি। তবে শুরু হয়েছে নন্দকিশোরের তাবিজ বানানোর রাত থেকে। নন্দকিশোরের তাবিজ বানানোর জন্য সাধুবাবার সাধনায় বসার কথা ছিল। নিশিরাতে ভৈরবী সাধনা। ব্যাপারটা কিরকম তা নন্দকিশোর জানেন না। সেই গোপন সাধনার কথা জানারও কোন উপায় নাই। তাতে সাধনায় সিদ্ধি হয়না। ফলে নন্দকিশোর তা জানার চেষ্টা করেন নি। তবে সাধুবাবার ইচ্ছায় এবং নন্দকিশোরের হুকুমে হুপো আর চ্যাং সাধুবাবার সব কাজে সাহায্য করেছে। গোবিন্দর মেয়েকে তুলে এনে মন্দিরের ঘরের মধ্যে সাধুবাবার কাছে হাজির করেছে। যদিও তুলে আনার ব্যাপারে হুপো আর চ্যাঙকে নাকি বিশেষ কোন বেগ পেতে হয়নি। মেয়েটি নাকি প্রায় স্বেচ্ছায় ওদের ইঙ্গিতে নিশিরাতে শ্মশানে এসে হাজির হযেছে। হুপো আর চ্যাং খুব সাবধানে মেয়েটিকে গোপনে বাঁকাচোরা পথ ধরে আগলে নিয়ে এসেছে। এ ব্যাপারে নন্দকিশোরের খুব ভয় ছিল। একটা কেলেঙ্কারী ঘটলেই সর্বনাশ! কিন্তু না, কিছুই ঘটেনি। সে মেয়ে তো মন্দিরে সারারাত সাধুবাবার ভৈরবী সাধনায় সাহায্য ক'রে খুব ভোরেই বাড়ি ফিরে এসেছে। এর পিছনে সাধুবাবার মন্ত্রতন্ত্র কিছু কাজ করেছে কিনা কে জানে! আর সাধনার গুহ্য কথা উহ্য থাকাই ভাল। তা শুনলে সংসারী মানুষের কর্মে বাধা ও জীবনে বিপত্তি ঘটে। নন্দকিশোর কোনদিন তা জানার চেষ্টা করেননি, করবেন না। কিন্তু এখন তো স্ত্রীর রকমসকম দেখে ও তার

কথাবার্তা শুনে নন্দকিশোরের মনে হচ্ছে কাজটা ভাল হয়েছে কী। নন্দকিশোর নিজের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে তাবিজ পাবার আশায় ব্যাপারটা অনুমোদন করেছেন। কিন্তু একটা সোমত্ত মেয়েকে নিশিরাতে যেভাবেই হোক ঘর থেকে ফুসলে বার কবে নিয়ে গিয়ে সাধুবাবার কাছে হাজির করানোর কাজটা বোধ হয় ঠিক হয়নি। শত হলেও গোবিন্দ তো ওঁদেরই কর্মচারী। তাছাড়া যদি কোনভাবে ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যায় তাহলে তো কেলেঙ্কারী বটেই, তাঁরও বিপদ অনিবার্য! যতই সাধনার ব্যাপার হোক, লোক জানাজানি হলে তো সর্বনাশ! স্ত্রীর কথাটা তো একেবাবে উড়িয়ে দেওয়া যায়না। তাছাড়া ওঁর আর সব কারবাবের গোপন কথা যদি ফাঁস হয়ে যায়, তাহলে ওঁর সেঁকো বিষ যোগাড় করা ছাড়া ভিন্ন কোন পথ নাই।

নন্দকিশোর এখন খুব দোটানায় পড়ে গেলেন। কিছুতেই তিনি ইতিকর্তব্য স্থির করতে পারছেন না। আরও একটা ব্যাপার বড়ই অদ্ভুত ঠেকছে ওঁর কাছে। গোবিন্দর সোমত্ত মেয়েটা এত সহজে এবং প্রায় স্বেচ্ছায় সাধুবাবার কাছে হাজির হল কিভাবে? ভুপোরা তো বলপ্রয়োগ ছাড়া কোনরকম কৌশল বোঝে না। তাহলে কি এব ভেতরে সাধুবাবার তন্ত্রমন্ত্র বা বশীকরণ কিছু কাজ করেছে? যদি তা-ই হয়, তাহলে তো সাধুবাবার দখলে কিছু অলৌকিক শক্তি আছে। নাকি মেয়েটির মনের মধ্যে কোন সুপ্ত বাসনা কাজ করছে? মেয়েটি এখনো সব কথা কাউকে নাকি ভেঙে বলেনি। ব্যাপারটা শুধু অদ্ভুত নয়, রহস্যজনকও বটে!

তবে একটা ঘটনা নন্দকিশোরের এখন মনে পড়ছে। ধর্ম-মহা-সম্মেলনের দিন সাধুবাবা বেশ কিছুক্ষণ ধরে গোবিন্দর মেয়ের কানে দীক্ষামন্ত্র শুনিয়েছিলেন। তখন ব্যাপারটা কেউ আমল দেয়নি। কাবণ দীক্ষার ব্যাপারে ব্যক্তিভেদে সময়ের হেরফের হতেই পারে। কিন্তু সেদিনই কি মেয়েটাকে সাধুবাবা পটিয়েছেন, নাকি মেয়েটাই সাধুবাবার মন্ত্রে বশীভূত হয়ে এগিয়ে গেছে? যেভাবেই হোক মেয়েটি সাধুবাবার সাধন-সঙ্গিনী হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে মেয়েটি শরীরের

ব্যাপারে যে একটু চন্‌মনে তা আগেও দু'একবার শোনা গেছে, ধর্ম-মহাসম্মেলনের দিনও কেউ কেউ নাকি টের পেয়েছে। এ নিয়ে গোবিন্দকে বহুবার অনেকেই গোপনে সাবধান করেছে। কিন্তু সে নিরুপায় হয়ে চুপচাপ থাকত। কারণ মেয়েকে পাত্রস্থ করা তার পক্ষে বড়ই কষ্টকর ছিল।

যাই হোক, একটা কথায় আছে ঝড়ে বক মরে আর ফকিরের কেরামতি বাড়ে। সাধুবাবা খুব সহজেই মেয়েটিকে সে রাতে মন্দিরে আনতে পেরেছিলেন ব'লে একটু গর্ব প্রকাশও করেছিলেন, নিজের অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ ক'রে নন্দকিশোরের সামনে বুক ফুলিয়ে নিজেকে জাহির করেছিলেন। তাঁর নিজের ক্ষমতার ওপর এতটা আস্থা আগে ছিল কিনা বলা শক্ত। সেই কারণেই হয়ত নন্দকিশোরের অনুমতি নিয়ে হুপোদের পাঠানো হয়েছিল। সাধুবাবা বলেছিলেন, প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগ করেই তুলে আনতে হবে। কিন্তু তার দরকার হয়নি। তাতে নন্দকিশোরই কেলেঙ্কারির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। কিন্তু এখন তাঁর বারবার মনে হচ্ছে কাজটা আদৌ ভাল হয়নি।

নন্দকিশোর ইদানীং কাজকারবার ব্যবসাপত্তর নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে কোন কথা ভাবার মত সময় তাঁর হাতে নাই। তবুও যেটুকু অবসর পাওয়া যায়, তার মধ্যেই তিনি ভেবে দেখলেন সাধুবাবা লোকটি মোটেই সুবিধার নয়, বরং বলা যায় বেশ ধড়িবাজ। ওসব তন্ত্রমন্ত্র সাধন-ভজন দেবতা-দেউল নন্দকিশোর বুঝতে চান প্রয়োজনের খাতিরে। তিনি বোঝেন ধন-দৌলত, মান-সম্মান, জগৎ-সংসার। এই বাস্তব প্রয়োজনে যা আসেনা, নন্দকিশোরের কাছে তার কানাকড়ি মূল্যও নাই। নন্দকিশোর সাধুবাবাকে এখানে এনেছিলেন ধর্ম কর্মের জন্য নয়, নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থে, ধর্মের আবরণে গোপন কারবার চালানোর জন্য। তার বেশী কিছু নয়। নন্দকিশোর টাকা বোঝেন। সাধুবাবা নন্দকিশোরের ধন বৃদ্ধির স্বার্থে যে-কোন কাজ করতে পারেন, কিন্তু তিনি নিজের ভোগসুখ বা আত্মতৃপ্তির জন্য কিছু করতে পারবেন না। নন্দকিশোর নিজের তাবিজের স্বার্থে সাধুবাবাকে-

যে-লাইসেন্স দিয়েছিলেন তা বারবার দেওয়া যাবে না। ধর্ম বা সাধনার নামে নন্দকিশোর কোনরূপ স্বেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দেবেন না। সাধুবাবা যদি নন্দকিশোরের চেয়ে এক কাঠি বাড়তে চান কিম্বা সেই রকম অভিলাষ মনে পোষণ করেন, তাহলে তাঁকে কোনভাবেই বরদাস্ত করা যাবেনা। সুতরাং এখন থেকে নন্দকিশোরকে সাধুবাবার সম্পর্কে অনুপুঙ্খ খবর নিয়ে খুব হিসেব করে সর্তক হয়ে চলতে হবে।

নন্দকিশোর এই সব ভাবতে ভাবতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর হাতে এখন অনেক কাজ। কাঠের মোকাম, কারখানা, আটা-ময়দার কারবার দেখাশুনা করে ব্যবসায়ী সমিতির অফিস, থানা ঘুরে শ্মশানে যেতে হবে। নন্দকিশোর আজকাল বাড়ির বাইরে গেলেই মোটর সাইকেল চেপে যান। কাজের পরিধি বেড়ে যাবার দরুন তাঁকে বহু দূর ছোটাছুটি করতে হয়। ফলে এই সব কাজ আদ্যোপান্ত করতে গেলে পায়ে হেটে তো দূরের কথা, মোটর সাইকেলে দ্রুত-বেগে যেতে না-পারলে সময়মত কাজ শেষ হয় না, বরং ক্ষতিই হয়ে যায়। নন্দকিশোর আজও দ্রুতগতিতে মোটর সাইকেল চালিয়ে সব কাজ শেষ করে শ্মশানে যাবেন স্থির করলেন। আজকাল রোজ শ্মশানে যাবারও সময় পান না। লোকজনের ওপর সব দায়িত্ব দেওয়া আছে বলে কিছুটা নিশ্চিন্ত থাকেন। কিন্তু একটা তদারক প্রয়োজন। সেজন্য তো বটেই, বিশেষতঃ সাধুবাবার হালচাল লক্ষ্য করার জন্যেই ওঁকে শ্মশানে যেতে হবে।

নন্দকিশোর সামনে স্থির দৃষ্টি রেখে ঘাড় উঁচু করে মোটর সাইকেলের গতিবেগ বাড়িয়ে দিলেন।

*　　　*　　　*

সাধুবাবা মন্দির লাগোয়া চোর-কুঠুরীর দরজা বন্ধ করে গোপন পরামর্শ করছেন। এতকাল কেবলমাত্র নন্দকিশোর সরকারের সঙ্গে এই রকম পরামর্শ করতেন। কিন্তু এখন চলছে তাঁর চামচেদের সঙ্গে। এখন সাধুবাবার সামনে বসে আছে হুলো হুপো ঢ্যাং চ্যাং। নতুন চার মাস্তান মন্দিরের বাইরে চারপাশে পাহারা দিচ্ছে। নন্দকিশোরের

সময়ের অভাবের দরুণ শ্মশানের যাবতীয় কাজ সাধুবাবার ঘাড়ে এসে পড়েছে। সাধুবাবা নন্দকিশোরের মাস্তানদের হাতের মুঠোয় এনে সব কাজ চালিয়ে নেন। ফলে কাজের হিসেব-নিকেশের জন্য সাধুবাবাকে ওদের নিয়ে বসতে হয়। নন্দকিশোর মাঝে মাঝে এসে সাধুবাবার কাছে কাজকর্মের খতিয়ান নেন। এই ভাবে ধাপে ধাপে হিসেব করে সমস্ত কাজ চলতে থাকে। আর নন্দকিশোর লাগাম ধরে গাড়ি চালিয়ে যান। কিন্তু গাড়ির চাকা উল্টো দিকে ঘুরছে কিনা তা ইদানীং নন্দকিশোরের তাকিয়ে দেখার অবসর নাই। সাধুবাবা নন্দকিশোরের চোখের সামনে রংমশালের আলো তুলে ধরেন। তাই বহু জিনিস এতদিন তাঁর নজরে যায়নি।

সাধুবাবা হুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, খবর কী?

হুলো বলল, ভাল নয়। সরকারবাবুর ঘরের স্ত্রী আপনার তাবিজ ধারণ করেনি।

সাধুবাবা বললেন, তাই নাকি! কারণ? আর কিছু খবর পেয়েছিস?

হুলো বলল, উসব শালা জানি না। একটা ঠ্যাং গিয়েছে, খবর নিতে গিয়ে আর একটা যাক।

সাধুবাবা বললেন, অত ভয় বা প্রাণের মায়া থাকলে কি কাজ চলে রে? সাহস রাখতে হয়।

চ্যাং বলল, তবে শোনেন মাইরি, আমার কাছে একটা খবর আছে। সরকারবাবুর বৌ বলেছে সাধুর সব অপকীর্ত্তি ফাঁস করে দিবে। এই শুনে তো শালা আমাব বুকের দরদ আরও বেড়ে গেল।

হুপো বলল, আবে রাখ, শুধু ঐটুকুন নাকি! আরও কী বলেছে জানিস? বলেছে গোটা দলকে মানে সাধুবাবা সমেত আমাদের সব শালাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিবে। বুঝলিস্?

চ্যাং বলল, শুধু সরকারবাবু বাদে আমাদের সব শালাকে হাজতে যেতে হবে। দারুণ খাপ্‌চুরিয়াস্ ব্যাপার, মেয়েমানুষ ক্ষেপলে শালা রক্ষে নাই। এখুন কী করবা, ভেবে দেখো সবাই।

সাধুবাবা বললেন, ঠিক আছে, ঘাবড়াস না। আমি আগে একটু ভাল করে সব খোঁজ খবর নিয়ে নিই, তারপর যা করার আমি করব। তোরা শুধু আমার পাশে থেকে সাহায্য করিস।

হুপো বলল, সাহায্য করার জন্যে তো আমরা সব সময় পাশেই আছি।

হুলো বলল, আর খোঁজ খবর করে কী হবে? আমরা খাঁটি কথা বলছি।

চ্যাং বলল, আপনি তো শালা সাধু মাইরি, আপনার আর কী! সাধুদের সাত খুন মাফ। মরবো শালা আমরা। জলে কুমির, ডাঙ্গায় বাঘ। এখুন আমরা মাইরি কোথায় গিয়ে দাঁড়াই?

চ্যাং বলল, পুলিশ, রূপচাঁদ, নন্দকিশোর সবাই মিলে আমাদের হালুয়া টাইট্ করে দিবে।

হুলো বলল, নন্দকিশোর বলছিস্ কিবে! বল্ তার বৌ। সরকার-বাবুর দোষ লিস না মাইরি।

চ্যাং বলল, একই কথা, সরকারবাবু কি তার বৌ ছাড়া? তিনি সোয়ামী বলে বেঁচে যাবেন, ইনি সাধু বলে; কিন্তুক জান লিয়ে টানা-টানি হবে শালা আমাদের।

সাধুবাবা বললেন, তোরা ঘাবড়াচ্ছিস কেন? আমি বাঁচলে তোরাও বাঁচবি। আমাকে একটু ভাবতে দে। আমি বলছি আমরা সবাই বাঁচব, কোন শালা আমাদের টিকি ছুঁতে পারবে না।

সবাই সাধুবাবার আরও কাছাকাছি গোল হয়ে বসল। সাধুবাবা কিছুক্ষণ চুপচাপ গোটা ব্যাপারটা ভাবতে লাগলেন। দেখে মনে হল সাধুবাবা যেন ধ্যান করছেন। সাধুবাবার মুখের দিকে তাকিয়ে সবাই চুপ।

চ্যাং মুখ ফসকে বলে ফেলল, মন্ত্রের জোরে কিছু একটা করা যায় না সাধুবাবা?

হুপো ধমকে উঠে বলল, চোপ্! সাধুবাবার ধ্যান ভেঙে গেলে মন্ত্র কাজে লাগবে? এ শালা হারামীদের লিয়ে তো আর পারা যায়

না দেখছি ! আরে, সাধুবাবা মন্ত্র দিয়েই সব লোপাট করে দিবে। বুঝলিস্ ?

এরপর আর কেউ কথা বলল না ! সাধুবাবা একটানা ব্যাপারটা ভাবতে লাগলেন।

যদি কথাটা সত্যি হয়, তাহলে এখানে আর বেশীদিন নয়। থানা-পুলিশ তোলপাড় হলে তো পুরনো কিস্‌সাও সব ফাঁস হয়ে যাবে। ফলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই জায়গা ছেড়ে পালাতে হবে। তবে এ-জায়গা ছেড়ে পালিয়ে যাবার আগে নন্দকিশোরের স্ত্রীর মুখ বন্ধ করার জন্য সামান্য ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। নন্দকিশোরকে পরখ করতে হবে। শেষকালে তাঁর চোখেও ধুলো দিতে হবে। আর রূপচাঁদকে খতম করে গভীর রাতে পদমের মেয়ে টগরকে একদিনের জন্য মন্দিরে তুলে আনতে হবে। নন্দকিশোরের এই দলকে দিয়েই এবার তাঁকে সব কাজ করতে হবে। নচেৎ স্ত্রীর চাপে পড়ে নন্দ-কিশোর হয়ত সবাইকে একদিন পুলিশের হাতে তুলে দেবেন। পুলিশের সঙ্গে নন্দকিশোরের আঁতাত, ওদের নয়। নন্দকিশোরের খুশীমত কেস সাজানো হবে·····

এমন সময় বাইরে যারা পাহারায় ছিল তারা খবর দিয়ে গেল নন্দকিশোর আসছেন। বহু দূরে তাঁর মোটর সাইকেলের ভট্‌ভটি শোনা গেছে। শব্দটা শ্মশানের দিকেই এগিয়ে আসছে। সাধুবাবা সমেত সবাই ছিটকে বেরিয়ে এল বাইরে। নন্দকিশোর ততক্ষণে প্রায় চোখের নিমেষে শ্মশানে কাঠের মোকামের কাছে পৌঁছে গেছেন। তিনি একপাশে মোটর সাইকেলটা খাড়া করে রেখে মোকামের গদিতে বসে চারপাশে একবার ভালভাবে তাকিয়ে দেখে নিলেন। মাস্তানেরা চারপাশ ঘিরে তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। সাধুবাবা হাত জোড় করে বিনয়ের ভঙ্গিতে পাশে এসে বসলেন। নন্দকিশোর সাধুবাবাকে একবার আপাদমস্তক দেখলেন। তারপর চোখ ছোট ছোট করে হুলোর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, আমার সঙ্গে আগামীকাল একবার দেখা করিস।

হুলো ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। সাধুবাবা বললেন, আপনার শরীর তো খুব ভাল যাচ্ছে না।

নন্দকিশোর সাধুবাবার দিকে একবার সন্দেহের চোখে তাকালেন. বললেন, কে বলল ?

—আজ্ঞে না, কেউ বলেনি. মানে আমি আন্দাজে বলছি। শুনলাম বাড়িতে মা আপনাকে একই কথা বলেছিলেন, তাই শুনে ভাবলাম, তাছাড়া আমার মনেও হচ্ছে তাই বলছিলাম যে—

নন্দকিশোর বহু পোড় খেয়েছেন, বহু ঘাটের জল খেয়েছেন, বহু ঝানু আর শায়েস্তা আদমি দেখেছেন, নিজে রীতিমত এসব বোঝার ব্যাপারে বেশ পোক্ত হয়েছেন, কিন্তু এক্ষেত্রে সব কিছু টের পাচ্ছেন না। অথচ বাতাস শুঁকে নন্দকিশোর কেমন একটা উৎকট গন্ধ চারপাশে পাচ্ছেন। নন্দকিশোর বললেন, কী ?

—বলছিলাম অবসর না-থাকলে কিম্বা শরীর খারাপ বুঝলে এদিকে যতটা পারেন কম আসবেন। আমরা তো এদিকে সবাই আছি। আমি নিজেই ওদের দিয়ে সব কাজ করে নেব। আপনি শুধু ওদেরকে আমার কথায় চলার নির্দেশ দিয়ে যাবেন।

সাধুবাবা হুলো হুপো সমেত গোটা দলবলকে আরও কাছে ডেকে নন্দকিশোরের সামনে কথাটা ভজিয়ে নিলেন। নন্দকিশোর এখন এদিকে যত কম আসেন ততই সাধবাবার পক্ষে সুবিধে।

নন্দকিশোর বললেন, আমি কিছু কিছু কারবার গুটিয়ে নিব ভাবছি। যেমন শ্মশানের সব কাজ।

সাধুবাবা হেসে বললেন, সেই ভাল। তাতে শান্তিতে ধর্মপথে থাকতে পারবেন, আমাদের কোন ঝঞ্ঝাট থাকবে না। আমি একমনে ধর্মকর্ম নিয়ে থাকব। তবে, আপনার এই শ্রীমানদের কিছু একটা হিল্লে করে দেবেন।

—ওরা থাকবে। কাজ থাক বা না-থাক ওরাই আমার আপনজন হয়ে থাকবে।

সাধুবাবা ভুরু কুঁচকে একবার নন্দকিশোরের দিকে তাকালেন,

তারপর প্রসঙ্গ বদলে বললেন, আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মা কি তাবিজ ধারণ করেছেন ?

—না, করেননি। সে এসব বিশ্বাস করে না।

—বুঝেছি। একদিন আপনার বাড়িতে বসে পূজা-অর্চনা হোম-যজ্ঞ করে তাবিজ শোধন করে ধারণ করতে দিব, অব্যর্থ ফল। আপনি দিন স্থির করুন। গ্রহশান্তি, সংসারের উন্নতি ও মঙ্গলের জন্যেও প্রয়োজন।

—না, এসব দরকার নাই। তাছাড়া আমার স্ত্রী এসব বিশ্বাস করে না, আমিও আর করি না।

সাধুবাবা পিছন থেকে যেন ঘাড়ে একটা অদৃশ্য গোত্তা খেয়ে একটু অপ্রস্তুত হলেন। তিনি মাথা নিচু ক'রে চুপ ক'রে রইলেন। নন্দকিশোর মোটর সাইকেলে ষ্টার্ট দিয়ে উঠে বসলেন, তারপর হুলো হুপো ঢ্যাং চ্যাং চারজনকে কাছে ডেকে ফিস ফিস ক'রে কানে কানে কী সব বললেন, তারপর ভট্‌ভটি চালিয়ে সশব্দে চলে গেলেন।

সাধুবাবার ঠোঁটে ধারাল ছুরির মত একটা জান্তব হাসি খেলে গেল। নন্দকিশোরের বাড়িতে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন সাধুবাবা, কিন্তু নন্দকিশোর সাধুবাবাকে শুধু এড়িয়ে যাননি, প্রত্যাখ্যান করেছেন। সাধুবাবা নন্দকিশোরকে পরখ করে ফেলেছেন। সুতরাং সাধুবাবার মত ও পথ চোখের নিমিষে স্থির হয়ে গেল।

* * *

রূপচাঁদ তার সাঙাতদের ডেকে বলল, ওই শালা নন্দ সরকার কী বেওসা জুড়েছে জানিস ? ও নাকি আটার মধ্যে আথুন ধুতরাং বিচি মিশাবার মতলব ছোড়্‌কে যত্ত সব পচা মাল পেষাই করে মিশেল দিছে ? উসব মাল খেলেও তো বিমার হবে, কেউ জিন্দা থাকবে না।

একজন বলল, তাতে নন্দ সরকারের কী আসে যায় ? সে তো ও মাল খাচ্ছে না। ওই পচা মাল খেয়েই তো আমার মুনে হয় এত মানুষ মরছে। ভেবে দেখ, এ-শহরে আগে তো রোজ এত লোক

মরত না। এখন হঠাৎ বাড়ল ক্যানে? এর কারণ কী? কি ভাবে জানা যাবে বলতো?

দ্বিতীয় জন বলল, শুধু আটা নয়, আজকাল সব মালেই ভেজাল। ভেজাল খেয়েই মরছে কিনা. বিশেষ করে কোন্ ভেজালটা খেয়ে মানুষ মরছে. এসব জানতে গেলে ফুড্ সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টে তোকে যেতে হবে। সেখানে গিয়ে বললে ওরা খোঁজ খবর লিয়ে তোকে জানিয়ে দিবে।

তৃতীয় জন বলল. তুই জজকোর্টে গিয়ে ওকালতি করগা, আমরা অত যুক্তি-ফুক্তি বুঝি না। শালা ফুড্ ডিপার্টমেণ্টে যাবে! কোথায় অফিস. কাকে গিয়ে বলবি এসব জানিস? ওখানে গিয়ে দেখবি টাকাব খেলা, মাল চালাচালি চলছে। ওখানে কথা বলতে গেলেও টাকা লাগে জানিস? আমাদের কী 'দায় ঠেকেছে ফালতু খরচা করতে যাব? দেশের মুরুব্বি, ভোট-পার্টির লোকজন, যারা কথায় কথায় বুকনি ঝাড়ে তারা করুক গা। তোরা কী ভাবছিস. সে শালারা কিছু জানে না?

চতুর্থ জন বলল, সবাই সব জানে। এই যে এত গাঁজা-হাসিশ, চোরাই মাল আসছে, কার মাল কোথায় পাচার হছে, সব পুলিশ জানে। কিন্তু কেউ কিছু করবে না, দেশের মুরুব্বিরাও চোখ বুজে চুপ করে থাকবে। সব রফা আছে, বুঝলিস্? আমরা কিছু করতে গেলেই শালা সবার শত্রু হয়ে যাব। আমরা কাহারো ক্ষতি করি না, দুটো পয়সা কাহারো পকেট থেকে ঝেঁপে লিই না, শুধু মাল চালা-চালি করি বলেই মাইরি সবার চক্ষুশূল! তো দে শালারা আমাদের চাকরি দে, কি ব্যবসা করবার টাকা ধার দে, তা কেহু দিবে না। তা এইসব পাবলিক লিয়ে আমাদের মাথা ঘামাতে যাবার দরকার কী?

পঞ্চম জন বলল, আমার শালা খুব খারাপ লেগেছে, যেদিন শুনলাম গোবিন্দর মেয়েকে হুপো আর চ্যাং তুলে কি ফুসলে লিয়ে গিয়ে সাধুর হাতে ছেড়ে দিয়ে এসেছে। আমার তো মনে হয় সাধু শালা সারারাত ধরে মেয়েটার ওপর রেপ্ করেছে।

প্রথম জন বলল, ছ্যাখ, ওই ছুঁড়িটাও কম পাজি লয়। ছপোরা ওকে যখন লিয়ে যায় তখন সে চিল্লায় নি ক্যানে? আর সাধু রেপ করেছে কিনা তা তুই কী করে জানলি? নিজের চোখে না-দেখে কিছু বলবি না।

পঞ্চম জন বলল, তো একটা সোমত্ত মেয়েকে মা কালীর মত দাঁড করিয়ে পায়ে ফুল-দুব্বো দিয়ে পুজো করবে, না?

—তাই করে। তুই জানিস না। তা না-হলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না। তাই তো শুনেছি।

—কে বলেছে তোকে? যত সব বুজরুকি? কে কী বলে তা আমাদের শুনে কাজ নাই। আমি যে রিপোর্ট পেয়েছি, তাই ঠিক। বুঝলিস? এই সাধু শালা পুরনো দাগী আসামী। এখানে সাধু সেজে লুকিয়ে আছে। লাইনটা তো দারুণ। খুন করে শালা সাধু হলেই সাত খুন মাফ। এই দেশের মানুষও শালা বুর্বাক, ওর পায়েই প্রণাম ঠুকতে যায়, তাবিজ, জলপড়া লিতে যায়। তো আমি বলি কি পুলিশকে সব ব্যাপারটা খুলে বলে দে, সাধু শালার হাজতবাস হোক।

রূপচাঁদ বলল, আবে পুলিশকে চিনিস না, উরা শালা হামাদের দাগী আসামী বলে হাজতে ভরে দিবে।

দ্বিতীয় জন বলল, ঠিক কথা। আমরাও তো কিছু বেআইনী করি, সেই অজুহাতে ভরে দিতে কতক্ষণ!

তৃতীয় জন বলল, আমার মনে হয় পুলিশের সঙ্গে সাধুর রফা আছে। তা না-হলে সাধু শালা এত সাহস পায় কোত্থেকে? পুলিশ বলবে তুই পার্টিই করে খাচ্ছিস খা, আবার মাটি খুঁড়ে কেঁচো বার করতে যেছিস ক্যানে? তবে আমরা জোরজুলুম করলে পুলিশ শালা হয়ত আমাদেরই হাজতে ভরে দিবে!

চতুর্থ জন বলল, আবে, সেই কথাই তো হছে। তবে এর মধ্যে একটা কথা আছে, পুলিশ সব ব্যাপার এখুনো নাও জেনে থাকতে পারে! পুলিশ তো শালা আমাদের চেয়ে লেটে খবর পায়। সাধু

শালা মহা হারামী! এমুনও তো হতে পারে কোন রফা হয়নি, পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে সাধু দিব্যি আরামে শয়তানি করে যেছে।

প্রথম জন বলল, হতে পারে। তবে সাধু যে হারামী তা আমি সভাব দিনেই বুঝেছিলাম। সে অনেকক্ষণ ধরে গোবিন্দর মেয়েব কানে কানে কী বলছিল কে জানে! নন্দ সবকার তো এই জন্যেই সাধুর ওপব চটেছে। তবে আমি তো আগেই বলেছি ছুঁড়িটাও খুব খচ্‌রী. সে বহু ছোঁড়াকে নাচিয়েছে, সভাব মধ্যে অন্ধকারে ওই বেশী গুঁতোগুঁতি কবেছে।

পঞ্চম জন বলল, যাই হোক, সবই তো সাধুব জন্যেই ঘটেছে! উ শালাব কী কবা যায় বল্‌। তোরা তো বলছিস্‌ পুলিশকে জানাতে গেলে আমরা মুস্কিলে পড়ে যাব। তাছাড়া সাক্ষী-প্রমাণ, আইন-আদালত বহু ঝঞ্ঝাট আছে।

রূপচাঁদ বলল, হামরা উ সব আইন-আদালত বুঝি না, পরের দুয়োরে ধর্না ভি দিতে যাবো না। হামি বলি কি পুলিশে গিয়ে লাভ নাই! হামাদের হাতে বোমা আছে, পিস্তল ভি আছে, গায়ে তাকত আছে, আজ রাতে সব জমায়েত হো যা। আজই শালা গোটা গুষ্টির ষষ্ঠী পূজো করে দিয়ে আসি। এই সাধু শালাই হামার বহুড়িকে তুলে লিয়ে যেতে চেয়েছিল। আভি সব সমঝ গিয়েছি। উ শালাকে খতম করতে হবে। এই সব খবর হামি আগে পেলে তো সাধু শালাকে আগেই খতম করে দিতাম। আউর সরকাববাবু বহুত খারাপ কাম করছেন, খুব ভুল কাম করছেন।

পঞ্চম জন বলল, কিন্তু নন্দ সরকার তো শ্মশানে আব যায় না, ওকে বউ খুব ঠেঙ্গিয়েছে।

রূপচাঁদ বলল, ছোড়্‌ দো ভাইয়া ফালতু বাত, উসব হামি জানি। সরকারবাবু টাকার জন্যে বহুত বাজে আদমিকে ডেরা দিয়েছেন, পরে ভুল বুঝতে পারবেন। সরকারবাবু আউর উন্‌কো বিবি দোনো ভি সাধুর ওপর খোড়া চটেছেন, হামি রিপোর্ট পেয়েছি। লেকিন উসব বাত ছোড় দো. হামলোগকা কাম হামলোগ করেঙ্গে। হামরা আজ

রাতে শ্মশান রেড্ করে যাকে পাব খতম করব। মাল রেডি রাখ, রাতে সব জমায়েত হো যা। এইসা চান্স আউর কভি নহী আয়েগা।

পঞ্চম জন বলল, ঠিক কথা। এর পর তো আমরা ই লাইন ছেড়ে দিয়ে আলুর ব্যবসা করব।

রূপচাঁদ বলল, জরুর! কিঁউ নহী করেঙ্গে? রুপিয়া রেডি, কোল্ড্ ষ্টোরে মাল রাখব, বেচা-কিনা চলবে। তখন মুন চায় তো পিস্তল ধরব, নহী তো বাবুমশায়েব মতুন ঘুরে বেড়াব। হামলোগকো লিয়ে ইয়ে লাষ্ট চান্স আ রহা হ্যায়। আজ রাতমে সব তৈয়ার হো যা।

সকলেই প্রায় সমস্বরে বলল, ঠিক হ্যায় গুরু, ঘাবড়াও মাৎ। আমরা সবাই রেডি।

রূপচাঁদ বলল, তাহলে আখুন হামি ঘরে চললাম। হামি দিনরাত ঘরকা বাহার থাকি বলে টগর খুব কাঁদে, দেখে খুব দরদ লাগে মাইরি! শাদীকে বাদ তো খালি বাহারমে ঘুরছি, ওকে একটুও আদর করতে পারিনি।

সকলেই হো হো করে হেসে উঠল।

রূপচাঁদ বলল, তোরা হাসছিস মাইরি! তোরা সবাই বামুন কায়েত বদ্যির লেড়কা। ঘরে গেলে তোদের মা-বহিনেরা কত আদর করে, কভি কভি গালি দিলেও ভালবাসে। আউর হামি শালা মুর্দাফরাস, মা নাই, বুড্ঢা বাপ, কুনো শালা হামাকে পুছে না, আদর করে না। তো হামার একঠো বহুড়ি, সে হামাকে আদর করলে হামি করব না ক্যানে, তোরা বল্? তোরা হাসিস না মাইরি।

প্রথম জন বলল, করবি না ক্যানে, আমরা কি মানা করেছি? করাই উচিত। তোর বৌ তো খুব ভাল মেয়ে। তুই ওকে কষ্ট দিস না রূপচাঁদ। মেয়েছেলেকে কষ্ট দিলে পাপ হয় জানিস?

দ্বিতীয় জন বলল, একথা সবাই জানে, কিন্তু কাজের সময় ভুলেও যায়। তবে রূপচাঁদ ভুলবে না।

তৃতীয় জন বলল, আবার মেয়েছেলেও পুরুষকে কষ্ট দেয় তা জানিস?

চতুর্থ জন বলল, ফালতু কথা রাখত। রূপচাঁদ তুই ঘরে যা। আর তোর বৌকে বলিস রাতে ছুরি হাতে লিয়ে আমাদের দলের নেতি-গিরি করবে।

পঞ্চম জন বলল. নেতি কীরে? বল্ নেত্রী। স্ত্রীলিঙ্গে নেত্রী হয়রে বোকা!

সকলেই ফের হো হো করে হেসে উঠল।

চতুর্থ জন অপ্রস্তুত হয়ে সকলের দিকে তাকাল, বলল, কি জানি শালা, উসব লিঙ্গ লিয়ে কারবার আমরা বহুদিন ছেড়ে দিয়েছি। তো তাই হল। বৌকে হাজির থাকতে বলিস রূপচাঁদ।

রূপচাঁদ হেসে ঘরের দিকে রওনা হল।

* * *

রূপচাঁদ ঘরে ঢুকে দেখল টগর কাজে ব্যস্ত পদম ও শুখরাম ঘরে নাই। টগর একবার রূপচাঁদের দিকে তাকিয়ে ফের ঘর সংসারের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। রূপচাঁদ বুঝল টগব রাগ করেছে। রূপচাঁদ বলল, ওরা সব কাঁহা গেল টগর?

টগর ঝাঝালো গলায় বলল, হামি ক্যায়সে জানব? কৌন্ আদমি কাঁহা যায় হামার জানা কেয়া দরকার। ম্যাঁয় থোড়ী ঘরওয়ালী হুঁ! ইস মকানমে রসুই বনানেকে লিয়ে আয়ী থী, রসুই বনাতী হুঁ।

রূপচাঁদ বুঝল টগরের বেশ রাগ হয়েছে। সে চারপাশে তাকিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এল। তারপর সে টগরের কাছাকাছি এসে দাঁড়াল, বলল, তুমহার খুব গুস্সা হয়েছে টগর?

টগর রুক্ষ গলায় বলল, দরওয়াজা খোল, বাহার যানেকা জরুরত হ্যায়।

—আই বাপ্! তুমহার এত রাগ হয়েছে? বেশ মাফ চাইছি, থোড়া হাসো টগর।

—রাস্তা ছোড়, বহুত কাম হ্যায়। মুঝে কাম করনে দো। এঁহা রহেনেসে তুমকো কেয়া ফয়দা? তুম আপনা কাম করো। বহুত আদমি কাম করতা হ্যায়, লেকিন এইসা কাম হাম কভি নহী দেখা।

—জানো টগর, আদমি যখুন রেগে যায় তখুন নাকি খুব উল্টা-পাল্টা বকে! তো তুমহাকে দেখে হামার তা মালুম হছে। মাথা ঠাণ্ডা রাখো, মিঠি মিঠি বাত বলো, দিল খোলসা করে হাসো, দেখবে কাজ-কামে, বাতচিতে কোন ভুল হবে না।

—যাও! রাতদিন টো-টো কোম্পানিকা নোকরি করে আখুন হামাকে সমঝ দিতে এসেছে!

রূপচাঁদ হো হো করে হেসে উঠল, বলল, বাপরে বাপ! ঘরওয়ালীর এত গুস্‌সা থাকলে ঘরে থাকা যায়? তারপর গলার স্বর খাদে নামিয়ে বলল, আর কটা দিন সবুর করো. আলুর বেওসা জুড়লে তখুন হামি রাতদিন ঘরেই থাকব।

—খালি ঝুটা বাত! তুমহি ঘরমে থাকলে তো এ-দুনিয়া ওলট-পালট হয়ে যাবে!

রূপচাঁদ টগরকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলল. ঝুটা নয়, সচ্ বাত বলছি।

—মুঝে ছোড়্ দো রূপচাঁদ! টগরের চোখ দুটো জলে ছলছল করে উঠল, বলল, তুমহি ঘরে থাকো না ক্যানে তা হামি সমঝ গিয়েছি। দেখো হামি একদিন উধাও হয়ে চলে যাব।

রূপচাঁদ আরও শক্ত করে টগরকে জড়িয়ে ধরে বলল, ছিঃ ছিঃ! ইসব কী অগড়বগড় বকছো? তুমহার মগজ খাবাপ হয়ে গিয়েছে নাকি!

—ঠিক বাত বলছি। হামি তো বাপকা কুড়ানি লেড়কী, হামার জাত জন্ম কেছু জানে না। তুম ভি নহী। শাদীকে বাদ তাই তুমহার বহুত আফসোস হয়েছে, সেই জন্যে তুমহি ঘরে থাকো না। তাই না, রূপচাঁদ?

—ছিঃ ছিঃ! ইয়ে কেয়া বাত! হামার মগজমে তো কুছু ঢুকছে না! ইয়ে বাত তুমকো কৌন্ বোলা? মেরা মালুম হ্যায় কি আপসে আপ তুম সব সোচ্ লিয়া!

রূপচাঁদ এক হাত দিয়ে টগরের মুখ চেপে ধরে। টগর রূপচাঁদের

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে, কান্নাকাঁপা গলায় বলে, ইস দেশমে গঙ্গা বহতী হ্যায়—

রূপচাঁদ দু'হাতে টগরকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলল, ফালতু বাত বলবে না—

—হামি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে একদিন জান জুড়াব দেখে লিও।

—ছিঃ! টগর, হামার খুব খারাপ লাগছে! হামার কসুর হয়ে থাকলে মাফ করো। লেকিন ইসব ফালতু বাত বললে হামার মেজাজ বিগড়ে যাবে। হামাদের জিন্দেগী বরবাদ হয়ে যাবে। হামি তুমহাকে লিয়ে সুখে বাঁচতে চাই, জাত জন্ম লিয়ে নয়। উসব হামি বুঝি না! ইসব তুমহি হামাকে কখুনো বলবা না। হামাকে মাফ না-করলে হামি তুমহার পাঁ চেপে ধরব টগর, লেকিন ইসব বাত হামি শুনব না।

টগর রূপচাঁদের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, ছিঃ। তুমহি হামার পাঁ ছুলে হামার গুনাহ হবে। ইসব বাত বলতে হয় না।

রূপচাঁদ হেসে বলল, ও হো! নিজে যা খুশী বলবা, হামি বললে দোষ? তুমহি যদি কখুনো ফের উসব বাত বলো, কি নিজের মনে ভাবতে থাকো, তো হামি পাঁ ধরে টানব। আর কখুনো তুমহি ইসব বাত বলবে না, হামাকে কথা দাও।

টগর রূপচাঁদের মুখের দিকে একবার তাকাল, তারপর সে নিঃশব্দে রূপচাঁদের বুকে মাথা রাখল।

এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল। রূপচাঁদ আর টগর দু'জনেই পরস্পর সরে দাঁড়াল। রূপচাঁদ মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে বুক টান টান করে দাঁড়াল। কারণ সে জানে, এখন তার চারপাশে শত্রু। কে কখন আক্রমণ করবে বলা শক্ত। সে দৌড়ে এসে দরজা খুলে দেখল ভয়ের কিছু নাই। পদম আর শুখরাম ফিরে এসেছে। রূপচাঁদ আশ্বস্ত হল। বরং সে একটু অপ্রস্তুত হয়েই সরে দাঁড়াল। টগর পাশ কাটিয়ে রান্নার কাজে চলে গেল।

শুখরাম বলল, আরে তু আ গয়া বেটা? এ পদম ভাইয়া, আজ-ফির সব এক সাথমে খানা খায়েঙ্গে।

রূপচাঁদ বলল, তুমরা কুথা যাও, কেয়া কাম করো, মেরে সমঝমে তো কুছু আসেনা, হামি ঠিক বুঝতে পারিনা।

পদম বলল, শ্মশানের কাজকাম বহুত বেড়ে গিয়েছে বেটা, হামলোগ দো আদমি জেয়াদা হিমসিম খেয়ে যেছি।

রূপচাঁদ বলল, হামার আলুর কাম জলদি শুরু হয়ে যাবে। তখুনি হামি সব খরচা একেলা চালাতে পারব। আখুনও হামার কোন অসুবিধা নাই। হামি তো আগে বলেছি শ্মশানের কাম হামার পসন্দ্ নয়, উসব কাম ছেড়ে ঘরে থাকা ভাল। বুড্ঢা আদমি আউর কী কাম করবে? আপলোগ ঘরমে বৈঠকর আরাম লিজিয়ে।

পদম বলল, ইসব বাত তুমহার ঠিক নহী রূপচাঁদ, ইসব তো হামলোগকো জাত ধরম কা কাম হ্যায় বেটা; যব হাঁক আয়েগা, হামলোগকো জরুর যানা পড়েগা। শ্মশানকা কাম, আদমিকো ইন্তাকাল! হামলোগ কিঁউ নহী যায়েঙ্গে?

রূপচাঁদ বলল, ঠিক হ্যায়, আদমির ইন্তাকাল এলে পাশে দাঁড়াতে হয় তা হামি মানি, লেকিন জাত ধরম হামি মানি না। যারা লড়াই বাধায় উসব তাদের বুকনিবাজি। হামার সাথে তো কত উচা জাতের লেড়কারা ঘুরে, একসাথমে সব খানাপিনা করে, বেওসা ভি করে, উরা তো ইসব বাত বলে না, হামাকে তো কেহু মুর্দাফরাস ব'লে ঘিন্না করেনা। শুনিয়ে, তুনিয়া বদল হো রহা হ্যায়, পুরানা কিস্সা ছোড্ দিজিয়ে। আখুন নয়া তুনিয়া এসে গিয়েছে। উসব ফালতু বাত ভুলে যেতে হবে। নন্দ সরকার কি আউর কুছু ধান্দাবাজ আদমি আপনা ধান্দাকে লিয়ে বুঝাতে পারে, লেকিন হামরা সব ওলট-পালট করে দিব। উসব কাম ছোড়্ দিজিয়ে।

পদম বলল, ঠিক হ্যায় বেটা, তুমহি ঠিকসে বেওসা জুড়লে হামরা ইসব কাম ছেড়ে দিব। তারপর শুখরামের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমহি কী বলো দোস্ত? তখুন তো হামরা আরামসে বৈঠকর বাতচিত্ করেঙ্গে। বুড্ঢা আদমিকো আউর কেয়া হ্যায়? খানাপিনা আউর মৌত্‌কে লিয়ে ইন্‌তিজার্ করনা! তাই না দোস্ত?

শুখরাম বলল, বিলকুল খাটি বাত। তো হামার একঠো বাত পুছ্না হ্যায় ভেইয়া। হামরা তো কাজকামে যেছি, ঘরমে ভি ফিরে আসছি; আউর উ বেটা জোয়ান লেড়কা, ছোটী বহুড়িকো একেলি ঘরমে ছোড়্কে রাতদিন কেয়া কামমে কাঁহা কাঁহা মুলুক চলা যা রহা হ্যায়। বেটাকো পুছো তো ভেইয়া, ইয়ে উস্‌কা কেয়া বিচার হ্যায়! দিনকাল খারাপ। কখুন কী ঘটে কে জানে! হামাদের জান হাঁক-পাঁক করে, মাঝে মাঝে এসে খবর লিয়ে যাই। আউব তু ক্যায়সা জোয়ান লেড়কা, রাতে ভি ঘবে থাকবিনা! বেচারী দিলমে দরদ লিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ইসব বিচার ভেস্তে গেল। হামরা শ্মশানের কামে না-গিয়ে ঘর পাহারা দিব, আউব তু খুশীসে ঘুরে বেড়াবি, সেইজন্যে তু বলছিস, শ্মশানের কাম, জাত ধবম ইসব পসন্দ্ নয়। সমঝা ভেইয়া? হামলোগ সিপাহী বন্‌কর বেটাকো ঘর পাহারা দিব, এহি হ্যায় উস্‌কা মতলব! যো লেড়কা শালা আপ্‌না কামকা বিচার ঠিকসে নহী কর সকতা, উও ক্যায়সে দুসরা আদমিকো বিচার কর রহা হ্যায়! ইয়ে বাতঠো উস্‌কো পুছো তো ভেইয়া।

রূপচাঁদ মাথা নিচু করে চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর মুখ তুলে নরম সুরে সে বলল, হামাব কসুর হয়ে গিয়েছে, হামি মাফ চেহে লিছি আলুকা বেওসা শুরু হলে হামি বেওসা টাইমকা বাদ সারাক্ষণ ঘরে থাকতে পারিব। হামাদেব বেওসা জলদি শুরু হয়ে যাবে। হামি টগরকে বলেছি, বাত দিয়েছি। তখুন তুমহ্‌রা যেখানে মুন চায় যেতে পারবা। লেকিন শ্মশানকা কাম করতে গেলে আগে সাধু আউর সরকার দোনো আদমিকো শ্মশান থেকে হাঁকাতে হবে। তা না-হলে উসব কামে শুধু লোকসান নয়, বিপদ ভি ঘটবে। সেই-জন্যে হামি বললাম উসব কাম হামাব পসন্দ্ নয়। হামার বাত ইয়াদ রাখবা।

পদম বলল, ঠিক হ্যায় বেটা, তুমহার বাত হামরা সমঝ গিয়েছি।

শুখরাম বলল, তু যা বলছিস্, হামরা সব জানি। তবে আদমি একখেপ দখল পেয়ে গেলে তাকে জায়দাদ থেকে হটানো জেয়াদা

তকলিফ কা কাম। সমঝা বেটা? বুকনিবাজি আউর কাম দোনো মে বহুত ফারাক হ্যায়।

*   *   *

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। দূরে মেথর পাড়ায় ঢোলক বাজছে। ঝাড়ুদার আর ভাঙ্গিরা আকণ্ঠ দারু পান করে রং তামাশায় একে অন্যের গায়ে ঢলে পড়ছে। এখন তাদের আর কোনদিকে হুঁশ নাই। একটু পরেই এ পাড়া নিশুতি হয়ে যাবে, গভীর ঘুমে সবাই ঢলে পড়বে।

পদম ও শুখরাম সন্ধ্যের পর থেকে ঘরেই থাকে। রাতের মড়া এলে তার দায়িত্ব থাকে হুপোদের ওপর। কিন্তু আজ হুপোরা ওদের দু'জনকে কিছুক্ষণ শ্মশানে থাকতে বলেছে। কারণ হুলো হুপোরা প্রায় সকলেই কয়েক ঘণ্টার জন্যে জরুরী কাজে বাইরে যাবে। ওরা ফিরে এলেই পদম আর শুখরামের ছুটি। তাই ওরা দু'জনেই আজ সন্ধ্যে থেকে শ্মশানে বসে আছে। সাধুবাবা ওদের দু'জনকে মেহেরবানি করে মায়ের প্রসাদী কারণবারি পাঠিয়ে দিয়েছেন। হুলো হুপোরা পদম ও শুখরামকে তা দিয়ে গেছে। একসময় যৌবন কালে এসব মালের ওপর ওদের দু'জনেরই দারুণ ঝোঁক ছিল, কিন্তু এখন আর নাই। শুখরাম ছেড়েছে হাঁফানির জন্যে, আর পদম ছেড়েছে টগর বড় হয়ে ওঠার পর থেকে। ফলে এখন আর ওদের কোন নেশা নাই। কিন্তু মায়ের প্রসাদ, তার ওপর সাধুবাবার ছোঁয়া লেগে এসেছে, অবহেলা করা উচিত নয়। কোন্ পাপে কী ঘটে যায় কে বলতে পারে! তাই ওরা দু'জনেই প্রাণভরে মায়ের প্রসাদ আকণ্ঠ টেনে ফেলল। প্রসাদ বেশ কড়া থাকার দরুনই হোক অথবা ওদের অনভ্যাসের ফলেই হোক দুজনেই নেশায় বেশ টইটম্বুর হয়ে পড়ল।

এখন পর্যন্ত শ্মশানে কোন মড়া আসেনি। হুলো হুপোদের অত্যাচারে আজকাল রাতে নেহাত বেঘোরে না-পড়লে মড়া নিয়ে শ্মশানে আসতে অনেকেই সাহস করে না। রাতের মড়ার সঙ্গে যাত্রীও কম জোটে। ফলে মড়া না-এলে ওদের কোন কাজ নাই। হুপোরা

ফিরলেই ওদের ছুটি। নেশার ঘোর একটু কেটে গেলেই ওরা ঘরে ফিরতে চায়। কারণ টগর আজ রাতে একলা ঘরে আছে।

আজ সন্ধ্যে থেকে শহরেও আলো জ্বলেনি। ফলে দোকান পাট বন্ধ করে সবাই ঘরে চলে গেছে। রাস্তাঘাট ফাঁকা। ভদ্রপাড়াতেও কোন কোলাহল নাই। চারদিক থমথম করছে।

রূপচাঁদের দল বোমা পিস্তল নিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। রাতের প্রথম প্রহরের অন্ধকার তখন ঘন হয়ে নেমেছে। অন্ধকার ঝোপেঝাড়ে তখন জোনাকি জ্বলছে। একটানা ঝিঁঝি পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে। দু'একটা রাতচরা পাখি গাছের ওপর বসে ডানা ঝাপটে উড়ে গেল। চারপাশ নিঝুম। কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নাই। ওরা দাঁড়িয়ে থেকে চারপাশে তাকিয়ে পরিস্থিতি বেশ ভাল করে পরখ করে দেখল। কাজ শুরু করার এই তো উপযুক্ত সময়।

রূপচাঁদ খুব ফিসফিস করে বলল, ভাবছি কিভাবে এটাক্ করা যাবে। পহেলে কি তামাম তল্লাট ঘিরাও করবি? গেরিলা, সাঁড়াশি, হিটলারী কুন্ টাইপ চালাবি?

রূপচাঁদের সাঙাতদের মধ্যে একজন বলল, দাঁড়া, আগে আমি ব্যাপারটা বুঝে আসি। দুশমন ঠিক কুন জায়গায় কিভাবে লুকিয়ে আছে তা না-জানলে কী অ্যাটাক্ চালাবি?

রূপচাঁদ বলল, ইয়ে তো ঠিক বাত হ্যায়। লেকিন খুব সাবধান! হামার তো মুনে হছে উ শালারা চুপচাপ বসে নাই। উরা ঘুমিয়ে থাকবে, আউর হামরা তাদের কচুকাটা করে ফিরে চলে আসতে পারব, তা ভাবিসনা। চারপাশে নজর রেখে খুব সাবধানে যাস্।

দ্বিতীয় জন বলল, দাঁড়া, তার আগে আমি একটা কথা বলে নিই। গোবিন্দর সোমত্ত মেয়েটা কাল সন্ধ্যাবেলা সাধুর কাছে এসেছিল। আগে তো রোজ ওর মায়ের সঙ্গে জলপড়া আনতে যেত। কাল নাকি ওর মায়ের শরীর খারাপ ছিল, সেইজন্যে মেয়েটা ওর বাচ্চা ভাইটাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল।

তৃতীয় জন বলল, এতক্ষণ তো বলিসনি! তুই কোত্থেকে খবরটা পেলি?

দ্বিতীয় জন বলল, বলার সময় পেলাম কোথায়? খবরটা কায়দা করে যোগাড় করেছি। আজ বিকেলে ওর বাচ্চা ভাইটাকে দেখে কী খেয়াল হল চারটে লজেন্স কিনে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। উঃ! ছোঁড়া কী চালু মাইরি! খুবই নচ্ছার ছোঁড়া! যা বললাম, শুধু ওইটুকু বলেই লজেন্সগুলো মুঠোয় পুরে দে ছুট! শালা সব কথা ভালমতন জানাই গেল না।

তৃতীয় জন বলল, রাতে ঘরে ফিরে এসেছিল কিনা খবর পাসনি?

দ্বিতীয় জন বলল, হ্যাঁ, জলপড়া নিয়েই নাকি ওরা ফিরে এসেছিল। ছোড়া তাই তো বললে।

চতুর্থ জন বলল, ব্যাপারটা খুব লটঘটে মনে হচ্ছে মাইরি! কিছু মাথায় ঢুকছে না!

পঞ্চম জন বলল, গোবিন্দ কি এসব জানে না, নাকি তারও মদত আছে? মেয়েমানুষের বুদ্ধি না-থাকতে পারে, অথবা সাধুর ওপর তাদের ভক্তি থাকতে পারে; কিন্তু গোবিন্দ শালা করছে কী?

দ্বিতীয় জন বলল, গোবিন্দ হয়ত কিছুই জানেনা, কিংবা জানলেও কিছু বুঝতে পারছে না। গোবিন্দর বৌ হয়ত খুব সরল মনে জলপড়া গিলিয়ে যেছে। হয়ত সেও কিছুই বুঝতে পারছে না।

তৃতীয় জন বলল, আবার এও তো হতে পারে যে সব কিছু বুঝে জেনেই বিশেষ কোন মতলব নিয়ে একাজ চালিয়ে যেছে।

প্রথম জন বলল, তাও হতে পারে। তো আজ এসেছিল কিনা জানিস?

দ্বিতীয় জন বলল, ওই তো যা বললাম। আজকের খবর কে জানে? তবে হ্যাঁ, ছুঁড়িটাকে ওবেলা একবার দেখেছিলাম মনে পড়ছে। মুখটা দেখে খুব খুশী খুশী মনে হল। কী ব্যাপার শালা কে জানে!

প্রথম জন বলল, রহস্য মাইরি। ফালতু পার্টির জন্যে আমরা লড়তে যেছি।

রূপচাঁদ বলল, ফালতু ক্যানে ? ধর গোবিন্দ ফালতু পার্টি আছে, লেকিন হামার বহুড়িকে তো সাধু আউর সরকার তুলে লিতে গিয়েছিল। হামি কি ফালতু পার্টি ? উ শালাদের শায়েস্তা না-করলে দেশের মা-বহিন সব্বাইকে উরা তুলে লিয়ে গিয়ে নষ্ট করে দিবে। ইটা বাদ দিলে উরা তো আউর বহুত খারাপ কাম ভি করছে।

প্রথম জন বলল, সেটা ঠিক। আমি গোবিন্দর কথা বলছিলাম। তোকে ফালতু পার্টি বলব ক্যানে ? ভুল বুঝিসনা দোস্ত। সত্যি মাইরি, সেদিন তুই ঘরে না-থাকলে খুব খারাপ হত।

রূপচাঁদ বলল, তাহলে বুঝে লে, হামি কি ফালতু তোদের ডেকে এনেছি ?

প্রথম জন বলল, শুনেছি সাধু শালা নাকি দেশের সব সোমত্ত মেয়েছেলেকে ভৈরবী বানিয়ে দিতে চায়।

রূপচাঁদ বলল, হ্যা, বানাতে দিছি। আজই সাধু শালাকে হামরা ভৈরব বানিয়ে দিব

দ্বিতীয় জন বলল, ভৈরবী কী মাইরি ! তোরা কেউ বুঝিস ?

রূপচাঁদ বলল, কেযা মালুম ! উসব বুঝে হামাদের কাজ নাই। হামরা এ্যাকসন্ বুঝি।

হঠাৎ কিসের যেন একটা শব্দ হল। ওরা প্রায় সবাই একসঙ্গে তটস্থ হয়ে উঠল। শুধু পঞ্চম জন বাদে আর সকলেই কান খাড়া রেখে শোনার চেষ্টা করল, শব্দটা ফের শোনা যায় কিনা !

পঞ্চম জন তখনও কী যেন ভাবছে। সে বিজ্ঞের ভঙ্গিতে বলল, ভৈরবী হল তন্ত্রমন্ত্র সাধনার ব্যাপার, ধর্মের ব্যাপার। কিন্তু এ-হারামী তো ধর্মের নামে খালি অপকম্ম করতে এসেছে। সাধু সেজে বদমায়েশি করা তো সুবিধে। আসল তন্ত্রমন্ত্র ভৈরবী সাধনা তো খারাপ জিনিস লয়। অবশ্য ব্যাপারটা আমি শুনেছি, কিছুই বুঝিনা।

প্রথম জন বলল, আবে চোপ্ ! এ শালাতো বড় ভন্ ভন্ করে কপ্চাতে শুরু করেছে ! তোর ওসব বুঝে লাভ কী ? যা করতে এসেছিস, কর ! চুপ করে শোন, কিসের যেন একটা শব্দ হচ্ছে।

পঞ্চম জন এই কথা শুনেই তটস্থ হয়ে উঠল এবং সেই মুহূর্তেই ফের একটা শব্দ হল।

প্রথম জন বলল, দাঁড়া থাম, আমি একটু এগিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা বুঝে আসি।

সে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ফের সট্ করে গুলির মত দৌড়ে ফিরে এসে বলল, ঝপাঝপ গাছ আর ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়, ওরা সাত-আটজন, বোমা-পিস্তল নিয়ে চারপাশে পাহারা দিছে, এগিয়ে আসছে কিনা তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে রূপচাঁদের ঘর আর শ্মশানের দিকেই মনে হল ওদের নজর। অন্ধকারে শালা ঠাহর করা গেল না ওদের মতলব কী!

রূপচাঁদ বলল. ঠিক হ্যায়, ওদের যা খুশী মতলব থাক, হামলোগকা কাম অভি তুরন্ত শুরু হো যায়েগা। সব ঠিকসে রেডি হো যা। পহেলে গেরিলা টাইপ, দুসরেমে সাঁড়াশি।

ওরা মুহূর্তের মধ্যে সারা অঞ্চলকে ঘিরে ধরল। রূপচাঁদের ঘরের দিক থেকে একটা নারীকণ্ঠের কাতর চিৎকার শোনা গেল। শ্মশানে কাঠের মোকামের দিক থেকে অতি ক্ষীণ গোঁ-গোঁ শব্দ মাঝে মধ্যে ভেসে আসতে লাগল। কিন্তু শ্মশান মন্দির অতি শান্ত, চুপচাপ। সেখান থেকে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। চারপাশ অন্ধকার। ঝোপঝাড় বনজঙ্গলে সমাকীর্ণ শ্মশান এলাকা। চোখে স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না। সবই ঝাপসা, অস্পষ্ট। দূরে শ্মশানের আশপাশে দুটি আবছা মূর্তিকে যেন ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে। রূপচাঁদের ঘরের দিক থেকে নারীকণ্ঠের উচ্চণ্ড রোল শোনা যাচ্ছে।

রূপচাঁদের সাঙাতদের একজন বলল, ভাগ্যিস্ রূপচাঁদের কথায় সবাই জমায়েত হয়েছি, তা না-হলে তো ওরা আজ ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে যেত। ওরা তো সব রেডি হয়েই এসেছে।

দ্বিতীয় জন বলল, চোপ্! এখন কোন কথা নয়। তারপর সে চোখ ছোটো ছোটো করে এপাশ ওপাশ দেখে নিচু হয়ে পরখ করে বলল, ওই যে! ওই যে শালা চারজনকে দেখা যেছে, ঝোপের মধ্যে

লুকিয়ে আছে। মার শালা ওখানে বোমা! হাতে সবাই পিস্তল রেডি রাখ! ঝাড়, পেটো ঝাড়। রূপচাঁদ, তুই হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের দিকে এগিয়ে যা! ঝাড় বোমা এই ঝোপে!

দ্বিতীয় জনের নির্দেশমত একটা বোমা পড়ল। এ যেন মৌচাকে ঢিল পড়ল। পরমুহূর্তে ওদিক থেকে বৃষ্টির মত বোমা এসে পড়তে লাগল। ততোধিক বোমা আর গুলির পাল্টা জবাব এদিক থেকেও ওদিকে গিয়ে পড়ল। দু'পক্ষের পরস্পর আক্রমণে, বোমা ও গুলির তীব্র তীক্ষ্ণ শব্দে সারা শ্মশান এলাকার স্তব্ধতা ভেঙ্গে গেল। বনভূমি, শ্মশানক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে রূপান্তরিত হল। রূপচাঁদ হামাগুড়ি দিয়ে নিজের ঘরের দিকে এগোতে লাগল। স্যাঙাতরা অনর্গল বোমা ও গুলির অতর্কিত আক্রমণে বিপক্ষকে প্রায় নাস্তানাবুদ করে ফেলল। এ-পক্ষের আক্রমণের তেজ ও কায়দা এমনই দুর্ধর্ষ যে বিপক্ষ বেশ কাবু হয়ে পিছু হটতে লাগল। এবার স্যাঙাতরা প্রায় ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

রূপচাঁদ হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের সামনে এসে অবাক হয়ে গেল। টগর ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে, হাতে একটা রক্ত মাখা ছুরি। টগরের চুল খোলা, চোখমুখ দিয়ে আগুন ঝরছে, শাড়ি খুলে পড়েছে, শুধু সায়া ব্লাউজ পরে সে যেন কালীমায়ীর মত রণরঙ্গিনী মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। রূপচাঁদ কখনও টগরের এত তেজ, এই ক্রুদ্ধ ভঙ্গি, এমন বীরাঙ্গনা মূর্তি ইতিপূর্বে কখনও দেখেনি। রূপচাঁদকে দেখে টগর কোন কথা বলতে পারল না। সে হাঁফাচ্ছে, তার রক্তিম অধর, নাসারন্ধ্র থরথর করে কাঁপছে। ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তার ভরাট উন্নত বুক ওঠানামা করছে। সে শুধু বনভূমির দিকে আঙুল তুলে দেখাল। দু'টি কালো মূর্তি তীরবেগে শ্মশানের দিকে ছুটে পালাচ্ছে। রূপচাঁদ তা দেখামাত্র মুহূর্তের মধ্যে স্প্রিঙের মত লাফ দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল এবং মূর্তি দুটির দিকে পরপর গোটা চারেক গুলি করল। কিন্তু না, গুলি লাগেনি। বোধ হয় একটু দেরী হয়ে যাবার দরুন গুলি ফসকে গেছে। রূপচাঁদের বড় আফসোস হল। রূপচাঁদ মূর্তি দুটির পিছু পিছু

তাড়া করে ধরবে বলে এগোতে গিয়ে বাধা পেল। টগর রূপচাঁদের হাত ধরে ফেলল। রূপচাঁদের দুর্মর সাহস আর জঙ্গী মনোভাব ক্ষোভে ও উত্তেজনায় যেন ফেটে পড়তে চাইছে। টগর আতঙ্কে ও উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছে। রূপচাঁদ টগরের মুখের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়াল! রূপচাঁদ টগরের হাত থেকে ছুরিখানা নিয়ে ওকে শাড়িটা পরতে বলল। টগর তাড়াতাড়ি লুটিয়ে-পড়া শাড়িখানা ঘরের ভেতর থেকে নিয়ে এসে গায়ে জড়িয়ে নিল।

টগর তখনও উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছে। রূপচাঁদ ওর চোখেমুখে হাত বুলিয়ে দিল। চুলটা জড়িয়ে এলো খোঁপা করে বেঁধে নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে টগর সংক্ষেপে ঘটনাটা রূপচাঁদকে জানাল।

টগর রসুই বানিয়ে ঘরে ঢেকে রেখে বাবা ও শ্বশুরের জন্যে অপেক্ষা করছিল। সন্ধ্যের আগেই তো ওরা রোজ ফিরে আসে। আজ আসতে দেরী হচ্ছে দেখে দরজাটা খোলা রেখেই টগর বিছানায় শুয়ে একটু গড়িয়ে নিচ্ছিল। দুপুরে সবাই খেয়ে বেরিয়ে যাবার পর টগর একটু নিদ গিয়েছিল বলে সন্ধ্যেরাতে ওর চোখে ঝিমুনিও ছিল না। তাছাড়া সবে তো সন্ধ্যে হল। ডোমের মেয়ে, বনজঙ্গলে নির্জন শ্মশান এলাকায় বাস, অত ডর করলে চলে নাকি! এমন সময় দেখা গেল দু'জন আদমি দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকছে। প্রথমে টগর ভেবেছিল, ওর শ্বশুর আর বাবা বোধ হয় এসে পড়েছে। কিন্তু তাতো নয়! তাহলে এরা কারা! দু'জনের মধ্যে একজন আবার খোঁড়া। প্রথম চমক আর চোখের ধন্দ কাটতেই টগর দু'জনকে চিনতে পারল। সেই প্রথম এই দুই আদমি ওকে জোর করে সরকারের কাছে ধরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। সেদিন সে দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে রূপচাঁদের ঘরে তার বুকেই আশ্রয় নিয়ে বেঁচেছিল। আর আজ তো সে রূপচাঁদের ঘরেই আছে, রূপচাঁদের ঘরনী হয়ে। সুতরাং কিসের ডর? মুহূর্তের মধ্যে সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল এবং প্রস্তুত হয়ে নিল। এবার আদমি দু'জন সরকারের বদলে ওকে সাধুবাবার কাছে নিয়ে যাবার প্রস্তাব এনেছে। ওরা জানাল যে আগেও নাকি এই একই প্রস্তাব

ছিল। আসলে ওকে সরকারের নাম করে ডেকে সাধুবাবার কাছেই নিয়ে যাওয়া হত। টগরকে দীক্ষা দেবার জন্যেই সাধুবাবার দারুণ আগ্রহ। আগে তো সবকারই মালিক ছিলেন, তিনি নিজেই সব কিছু দেখাশুনা কবতেন। তাই তখন মালিকের নামেই টগরকে ডাকা হয়েছিল, মালিকের হুকুমেই টগরকে দীক্ষা দেবার জন্যে সাধুবাবার কাছে নিয়ে যাওয়া হত। কিন্তু এখন তো সরকারের বদলে সব দায়িত্ব সাধুবাবাব ওপরেই পড়েছে। সুতরাং ওরা টগরকে সরাসরি সাধুবাবার কাছেই নিয়ে যাবার জন্যে এসেছে। কোন ঝামেলা না-করে চুপচাপ যাওয়া ভাল। ওরা টগরকে কোন গায়ের জোর দেখাতে আসেনি। ওরা আরও জানাল ঘণ্টাখানেক বাদেই টগরকে ফের ঘরেই পৌঁছে দেওয়া হবে। সাধুবাবার দীক্ষা পেলে টগরেব জীবন ধন্য হয়ে যাবে। টগর জীবনে সুখ ও শান্তি পাবে।

ব্যস্! টগর বুদ্ধিমতী। সে ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলল। সমস্ত ব্যাপারটা আঁচ করে সে ঘরের বাইরে যাবার এবং ওদেব প্রস্তাবে সম্মত হবার ভাবভঙ্গি দেখাল। কারণ ঘরের বাইরে যেতে না-পারলে তো চেঁচিয়ে লাভ নাই। শ্মশান থেকে ওর শ্বশুর ও বাবা বা অন্য কেউ ওর চীৎকার শুনতে পাবে না। তাই সে ওদের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল এবং ওদের সঙ্গে যাবার জন্যে এগিয়ে যেতে চাইল। ওরা দু'জন আগে, টগর পিছনে। দরজা দিয়ে বেরোতে যাবার সময় টগর রূপচাঁদের কথামত কোমরে সর্বদা গুঁজে-রাখা ধারাল ছুরিখানা তুলে পিছন থেকে দ্বিতীয় জনের ঘাড়ে ও গর্দানে বসিয়ে দিতেই সে লাফ মেরে বাইরে এসে মাটিতে গোত্তা খেয়ে পড়ল। সেই সময় টগর নিজেই শাড়িটা খুলে রেখে ওদের পাল্টা আক্রমণের জন্যে আরও প্রস্তুত হয়ে নিল এবং প্রাণপণে চেঁচাতে শুরু করল। ঘর থেকে বেরোনর সময় খোঁড়াটা প্রথমে ছিল। সে দ্বিতীয় জনের অবস্থা দেখে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে দৌড়তে শুরু করল। দু'নম্বর আদমিটা মাটিতে একদফা লুটোপুটি খেয়ে পাল্টা আক্রমণের জন্যে মাটিতে ভর দিয়ে

ওঠার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু গর্দান থেকে তার তখন ফিনকি দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। সে একহাত দিয়ে গর্দান চেপে ধরে উঠে দাঁড়াল। টগর তখন রণরঙ্গিনী মতিতে ছুরি বাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক সেই সময় ঝোপের ভেতর থেকে রূপচাঁদকে হামাগুড়ি দিয়ে আসতে দেখা গেল। বোধ হয় দ্বিতীয় জনের নজরে তা পড়তেই এক লাফ মেরে চোখের নিমিষেই সে দে ছুট্! তখন টগরের সাহস ও শক্তি এমনই বেড়ে গিয়েছিল যে সে দু'জনকেই একেবারে খতম করে দিতে পারত। যদিও টগর লক্ষ্য করেছে ওদের সঙ্গেও ছুরি ছিল। কিন্তু ছুরি চালানোর কোন সুযোগ টগর ওদের দেয়নি। অবিশ্যি রূপচাঁদ এসে না-পড়লে কী হত বলা যায় না। আর খোঁড়াটা প্রাণ-ভয়ে পালিয়ে না-গেলেও মুস্কিল হত। যদি দু'জনে মিলে একসঙ্গে টগরকে আক্রমণ করত তাহলে টগরকে ওরা জখম করে দিতে পারত কিন্তু চারপাশে বোমা ফাটার শব্দে বোধ হয় ওরা বুঝে গিয়েছিল ওদের জিন্দিগি খতম হয়ে আসছে, মৌত ঘনিয়ে আসছে।

টগরের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে রূপচাঁদ বুঝল সে দুলোকে মারতে পারেনি। ঢ্যাঙের গর্দানে ছুরি মেরেছে বটে, তবে আঘাত তেমন কিছু মারাত্মক নয়। তাই সে ওভাবে দৌড়ে পালাতে পেরেছে। এই ছুরিটা রূপচাঁদের হাতে থাকলে ঢ্যাঙের গলা ফালাফালা হয়ে যেত, বাছাধন একপা এগনো তো দূরের কথা, বাপরে বলারও সুযোগ পেত না।

ইতিমধ্যে রূপচাঁদের সাঙাতরা সবাই এসে পড়ল। বিপক্ষ দল পরাজিত হয়ে পালিয়েছে। হিসেব কষে দেখা গেল দু'পক্ষের কেউ খতম হয়নি। শুধু ঢ্যাঙের গর্দানে টগরের মোলায়েম হাতের ছুরির একটু মিষ্টি আঁচড় লেগেছে। সাঙাতরা সবাই টগরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। প্রায় সকলেই হেসে একবাক্যে জানাল যে এখন থেকে ওদের নেতৃত্ব আর রূপচাঁদ দেবে না, টগর হবে ওদের নেত্রী। কারণ ওরা এত বোমা ও পিস্তল নিয়ে একটা মশাও মারতে পারল না। আর টগর এক ছুরির কোপে গোটা দলকে হটিয়ে দিয়েছে।

রূপচাঁদ বলল, আরে ভাই, আখুন হাসি-তামাশার টাইম লয়, উসব পরে হবে! আভি সারা তল্লাট জুড়ে চিরুনি অপ্‌রেশন চালাতে হবে, দুশমন কাঁহা কৌন্ ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে আছে তা তল্লাশ করে দেখতে হবে। শত্রুর শেষ রাখতে নাই। ভোর হবার আগে আউর পুলিশ আসার আগে সব ল্যাঠা চুকিয়ে ফেলে ছুট্‌কা কাম শেষ করে দুসরা কামে যেতে হবে। ইয়াদ রাখো, শত্রু ভেগে পালিয়েছে, কি পাল্টা আক্রমণ করার জন্যে ঝোপে জঙ্গলে লুকিয়ে আছে তা কে বলতে পারে! শত্রুকে পেলে খতম করো—এই হল হামার সাফসুফ বাত। দুসরা বাত পরে হবে। আগে সারা তল্লাট ক্লীয়ার করো, পরে ঠাট্টা তামাশা করবে। চলো সবাই। টগর, হামলোগকো সাথ তুম ভি আ যাও।

তারপর শুরু হয়ে গেল ঝোপঝাড় বনজঙ্গল খানাখন্দ সর্বত্র সারা তল্লাট জুড়ে তন্ন তন্ন খোঁজ। চিরুনি তল্লাশ! না, কোথাও শত্রু লুকিয়ে নাই। শয়তানের দল সব পালিয়েছে। কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যে সব পালাল কোথায়? টগর, রূপচাঁদ ও তার সাঙাতেরা সবাই একসঙ্গে দল বেঁধে খুঁজতে শুরু করল সারা অঞ্চল, বনভূমি, নদীর ধার, বড়-রাস্তা, নিকটবর্তী মেথর পাড়ার অলিগলি, নেশাতুর মেথর বস্তির আনাচে-কানাচে সর্বত্র। কোথাও কাউকে খুঁজে পাওয়া গেল না। মধ্যরাত পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করে ওরা শেষ পর্যন্ত ফিরে এল ফের শ্মশানে। নন্দকিশোর সরকারের কাঠের মোকামের সামনে এসে ওরা সবাই অবাক হয়ে গেল। একী! পদম আর শুখরামের হাত-পা-কোমর আষ্টেপৃষ্ঠে দুটো আলাদা খুঁটিতে দড়ি দিয়ে বাঁধা, চোখেমুখে কাপড় বাঁধা। ওরা সবাই তাড়াতাড়ি পদম ও শুখরামের বাঁধন খুলে দিল। নেশার ঘোর তখন ওদের ছুটে গেছে।

টগর, রূপচাঁদ ও তার সাঙাতদের দেখে পদম ও শুখরাম প্রায় হাউ মাউ করে কেঁদে ফেলল। ওরা দু'জনে হাঁফাচ্ছে। প্রায় সারা রাত এভাবে থাকার ফলে ক্লান্তি, আতঙ্ক ও উত্তেজনায় ওরা ভেঙে পড়েছে, থরথর করে হাত-পা কাঁপছে। বুড়ো মানুষ। সারা রাত

ঘুম নাই, খাওয়া জোটেনি, গায়ে শক্তি নাই, মনেও ততটা বল নাই। ইনিয়ে বিনিয়ে ঘটনা বলার ক্ষমতা ওরা হারিয়ে ফেলেছে।

পদম ও শুখরাম ভাঙাভাঙা গলায় সংক্ষেপে যা বলল তার মর্মার্থ হল সাংঘাতিক। সন্ধ্যের কিছু পরে আঁধার ঘনিয়ে এলে হুলো হুপোরা জনা আষ্টেক মিলে জোর করে এভাবে ওদের বেঁধে রেখেছে। সাধুবাবা তখন মন্দিরে বসে কালীমায়ীর ভজনা গান করছিলেন। একজন মেয়েমানুষকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। অন্ধকারে তাকে চেনা যায়নি। তারপর চোখমুখ বেঁধে ফেলার দরুন ওরা আর কিছু দেখতে পায় নি, চীৎকার করতেও পারে নি। শুধু মাঝে মাঝে গলা থেকে গোঁ গোঁ শব্দ হয়েছিল। কিন্তু কে শুনবে, কে ওদের বাঁধন খুলে দেবে? এ ঘটনা ঘটবে জানলে ওরা সচেতন থাকত, যে ভুল ওরা করে ফেলেছে তা আর হত না। সন্ধ্যেরাতে সাধুবাবা মায়ের প্রসাদী কারণবারি পাঠিয়েছিলেন। তা খেয়ে ওদের দু'জনেরই দেহমন অবশ হয়ে না-পড়লে এভাবে বেঁধে রাখার ক্ষমতা বা গায়ের জোর ক'জন বীরপুরুষের আছে তা ওরাও দেখে নিত।

পদম ও শুখরামকে ঘরে নিয়ে যাবার জন্য রূপচাঁদ টগরকে নির্দেশ করল। ওরা দুই বুড়ো আদমি টগরের দুই কাঁধে ভর দিয়ে টলতে টলতে ঘরের দিকে এগিয়ে চলল। যাবার সময় ওরা দু'জনেই বলে গেল রূপচাঁদের কথা এবার থেকে পালন করে চলবে। এই নাকে কানে খত! নন্দকিশোর সরকারের কাঠের মোকামে এই সব কাম ওরা আর কখনও করবে না। ওরা নন্দকিশোরের বিপক্ষে স্বাধীন-ভাবে শ্মশানে কাজ করার চেষ্টা করবে। বাপরে বাপ! জীবনের কী হালত! এভাবে কি জাত-ধরমের কাজ করা যায়? আর একটু হলেই তো ওরা দু'জনেই আজ রাতেই দম বন্ধ হয়ে মরে যেত। মা কালী রক্ষা করেছেন!

রূপচাঁদ টগরকে স্নান করে খেয়ে নতুন জামাকাপড় পরে প্রস্তুত হয়ে থাকার জন্য নির্দেশ করল। ওরা সকলে নদীতে স্নান করেই ফিরবে। পদম ও শুখরামও যেন প্রস্তুত হয়ে থাকে তাও জানানো হল।

টগর, পদম ও শুখরাম চলে গেলে রূপচাঁদ ও তার সাঙাতেরা মন্দিরের ভেতর তন্ন তন্ন করে খুঁজল। সাধুবাবা উধাও! ঝুলিঝাম্পা, লোটাকম্বল সব কিছু নিয়েই সে ভেগে পড়েছে। ওরা জানত সাধুবাবাকে পাওয়া যাবে না। তবু শেষ চেষ্টা করে ওরা মন্দিরের বাইরে আনাচে কানাচে সর্বত্র খুঁজে দেখল। কোথাও সাধুবাবার কিংবা তার লোটা কমণ্ডলু ত্রিশূলের কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেল না।

সাঙাতদের একজন বলল, ও শালা সাধু নয়, শালা খুনী দাগী রেপ্‌কেসের আসামী। পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। কী দেশ মাইরি! কেউ কিছু বলে না, ভেবেও দেখে না।

আর একজন বলল, আমার তো মনে হয় এরপর লোকটা এখানে জাতে জাতে ধর্মে ধর্মে একটা লড়াই বাধানোর ধান্দা করত। আর সেই লড়াইয়ের ভেতর থেকে শালা ফায়দা লুঠত।

আর একজন বলল, ওর পিছনে নিশ্চয় কোন বড় শক্তির মদত আছে। তা-না হলে এসব চালানোর সাহস লোকটা পায় কেমন করে! খুবই লটঘটে কেস্ মাইরি!

রূপচাদ বলল, ইসব কিস্‌সা-কহানী বলার বহুত ফুরসৎ পাবি। চল্, আগে নাহানা সেরে লিই। টগরের কাছে যদি কুছু খাবার জোটে তো ভাল। রাতেই এই মুলুক ছেড়ে পালাতে হবে। ভোর রাতে গাড়ি। বুঝলিস্?

রূপচাঁদ ও তার সাঙাতেরা গঙ্গা নদীতে স্নান সেরে ঘরে ফিরে এল। টগরও নদী থেকে স্নান করে ফিরে এসেছে। হাঁড়িতে যে ভাত ডাল তরকারি ছিল সকলে মিলে ভাগ করে একমুঠো করে খেয়ে নিল। সকলেই প্রায় ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিল। কিছুটা দানাপানি পেটে পড়তেই ওদের সকলেরই ফের তেজ ও উদ্যম যেন ফিরে এল।

পদম ও দোস্ত শুখরাম স্নান সেরে ফিরে এসেছে। কিন্তু ওরা কিছু খেতে রাজী হল না। ওদের শরীর বড় ক্লান্ত। এখন খেলেই নিদ এসে যাবে, আর রওনা হওয়া যাবে না। ভোর হলে ট্রেনপথে যাবার সময় ওরা কিছু খেয়ে নেবে। বুড়ো মানুষ। এখন কিছু খেলে

ওরা একদম আর নড়তেই পারবে না। তখন এই বুড়টা দু'জনের জন্যেই শুভযাত্রা পণ্ড হয়ে যাবে। যদিও খাবার মত ঘরে আর কিছুই ছিল না : তবুও ওরা দু'জনেই জানাল যে না-খেলেই বরং ওরা চাঙ্গা হয়ে এখন কিছুক্ষণ চলতে পারবে।

পদম ও দোস্ত শুখরাম ইতিমধ্যে সমস্ত ঘটনা টগরের কাছে শুনে নিয়েছে। ওরা সবাই মিলে আপাতত কটা দিন তীর্থদর্শনে যাবে। আসলে তীর্থদর্শনের নামে এখন কটা দিন সকলের গা-ঢাকা দিয়ে থাকা দরকার। তারপর এলাকা শান্ত হলে ভালমত খোঁজ খবর নিয়ে ফিরে আসবে। নচেৎ পুলিশ এই এলাকায় হাঙ্গামার খবর পেয়ে সদলবলে এসে হাতের কাছে যাকে পাবে তাকেই হয়ত তুলে নিয়ে যাবে। সুতরাং ঝুটঝামেলা এড়াবার জন্যে রূপচাঁদের এই যুক্তি বাদ-বাকি সকলেই মেনে নিয়েছে। পদম ও দোস্ত শুখরাম এইরকম একটা মতলব আগেই দু'জনে মিলে ছক কেটে রেখেছিল। রূপচাঁদের তরফ থেকে ফন্দিটা শোনার পর ওরা দু'জনেই বেটার বুদ্ধির তারিফ করল।

ভোর রাতে গাড়ি। এখন বোধ হয় প্রায় শেষ রাত। হয়ত গাড়ির আর বেশী দেরীও নাই। টগর দুই তরফের দু'টো ঘরেই ভালমত তালা কুলুপ এঁটে দিল। তারপর পদম, দোস্ত শুখরাম, টগর, রূপচাঁদ ও তার সাঙাতেরা সবাই একসঙ্গে হন হন করে শেষ রাতের অন্ধকারে ষ্টেশনের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে লাগল।

* * *

পরদিন পুলিশ এল অনেক বেলায়। তখন রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। দারোগাবাবু সারা অঞ্চল ঢুঁড়ে একটা জনমনিষ্যির চেহারা দেখতে পেলেন না। ঝোপঝাড়, বনবাদাড়, ডোমবস্তি, শ্মশান ক্ষেত্র, নদীর ধার, বড় রাস্তা, এমন কি নিকটবর্তী মেথর পল্লীর সর্বত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। কোথাও সন্দেহজনক কোন ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া গেল না। নন্দকিশোর সরকারের কাঠের মোকামের ভেতরে বাইরে পাতি-পাতি করে খোঁজা হল শ্মশান মন্দিরের আশেপাশে নজর রেখে

এবার পুলিশ ঢুকল মন্দিরের ভেতরে। খুব সন্তর্পণে টর্চ ফেলে দারোগাবাবু ঘরের ভেতরে আনাচে-কানাচে খুঁজে দেখলেন। সাধুবাবা অন্তর্ধান হয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর লোটা-কম্বল, ত্রিশূল-কমণ্ডলু, কোন সম্পত্তি কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

দারোগাবাবু ঘরের বাইরে এসে আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, অ্যারেষ্ট করার মত কেউ নেই, রিপোর্ট লেখার মতও কিছু নেই। স্পটে কিছু পাওয়া না-গেলে আমাদের ফিরে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। ফালতু এই ভোরবেলায় তাড়াহুড়ো করে আসা হল। ভাল করে এককাপ চা পর্যন্ত খাওয়া হয়নি।

সেকেণ্ড অফিসার বললেন, স্যার, রূপচাঁদের দলের সঙ্গে শ্মশানের মাস্তানদের গতরাতে এন্‌কাউণ্টার ঘটেছিল।

দারোগাবাবু বেশ বিরক্তির সঙ্গেই বলে উঠলেন, দূর্ মশাই! রূপচাঁদের সঙ্গে এদের কী সম্পর্ক? সে কি ডোমের কাজ করত? ওর কারবার আলাদা। এখানে একটা গোপন চক্রের কিছু নিষিদ্ধ কারবার গড়ে উঠেছিল। দুটো জিনিস আলাদা। একসঙ্গে জড়াবেন না, তাহলে থই খুঁজে পাবেন না। দু'দলে এন্‌কাউণ্টার ঘটে থাকতে পারে, কিন্তু তার প্রমাণ কোথায়? শ্মশানের লোকজন, ডোমেরা, সাধুবাবা কেউ তো কোথাও নেই। এমন কি রূপচাঁদের দলেরও তো কেউ নেই যে জেরা করবেন। কাকে তুলে নিয়ে যাবেন, বলুন? তাহলে একটা মড়া আসার অপেক্ষায় বসে থাকতে হয়, কিংবা এই শুকনো কাঠগুলো তুলে নিয়ে যেতে হয়। অ্যাক্‌শন্ নেবার মত হাতের কাছে কিছু না-পেলে কী করতে পারি আমরা বলুন?

—স্যার, সাধুর বিরুদ্ধে আমাদের ওপর মহলে অনেক রিপোর্ট জমে আছে। ওর বিরুদ্ধে সব সিরিয়াস্ চার্জ আছে। লোকটা আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে বেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—কী মুস্কিল! ওসব আন্-অফিসিয়াল কথা বলে লাভ কী? ওপর মহল থেকে এখনও পর্যন্ত কোন ইন্‌ফরমেশন্ বা ইন্‌স্ট্রাক্‌শন্ আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে কি? কিংবা কোন নোট্ এসেছে?

ডেফিনিট না-হলে, কিংবা এখানকার ইন্‌ফরমারের কাছ থেকে কোন ওয়ার্নিং না-পেলে আমরা ইন্‌ভেষ্টিগেশন্ চালাব কি ভাবে? কী করে অ্যারেষ্ট করব? আর দেখুন মশাই, সাধুসন্তকে অ্যারেষ্ট করার আগে আপনাকে হাজার বার ভাবতে হবে। দিনকাল খুব খারাপ। কোথায় কার কোন্ সূত্র জড়িয়ে আছে কে বলতে পারে? তাছাড়া পাবলিক নিয়ে কাজ, পাবলিক ক্ষেপে গেলে আগে তো আপনার জান যাবে! তার ওপরে যদি কিছু সূত্র বেরিয়ে পড়ে তো ঠ্যালা সামলাবে কে? খুব ভালমত খোঁজ না-নিয়ে এগোনো মুস্কিল। মাথা আর চাকরি বাঁচিয়ে এ যুগে চলতে হবে মশাই। ইয়ংম্যান, অত হুট্ পাট্ করে কিছু করতে যাবেন না। তাতে নিজের বিপদ টেনে আনবেন, ওপর মহলের কাছে কোন এক্সপ্লানেশন দিতে পারবেন না। জান গেলে কেউ দেবে মশাই?

একজন কন্‌ষ্টেব্‌ল্ বলল, স্যার, নন্দবাবুতো ডোমেদের হাতে ব্যবসা তুলে দিয়ে এ অঞ্চলে বহুদিন আগে থেকেই শুনেছি আসা ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাঁর লোকজনদের নিয়ে শেষ দিকে সাধুবাবা নিজেই নাকি ব্যবসা চালাতেন। আবার ওদিকে গতকাল রাতে তো শুনছি তাঁর বাড়িতে ঘোর বিপদ নেমে এসেছে।

—তাহলে? দারোগাবাবু সেকেণ্ড অফিসারের দিকে তাকিয়ে বললেন, তাঁকে আমি এখন কোন্ যুক্তিতে, কিসের ভিত্তিতে ঘাঁটাতে যাব বলুন? বিশেষতঃ আজকের দিনে? তা'ছাড়া উনি একজন প্রতিপত্তিশালী মানুষ, শহরে তাঁর আধিপত্য আছে, ওপর মহলেও হাত আছে। অকারণে তাঁকে ঘাঁটিয়ে কি মরতে যাব মশাই? তাছাড়া ওঁর বিরুদ্ধে কারেন্ট রিপোর্ট তো কিছু নেই।

সেকেণ্ড অফিসার বললেন, তা অবশ্য নেই। উনি ইদানীং সব ধরা-ছোঁয়ার উর্ধ্বে ছিলেন। কিন্তু স্যার, ওঁর বাড়িতেও তো আমাদের এখুনি একটা তদন্ত করতে যেতে হবে।

—শুধু ওঁর কেন, গোবিন্দর বাড়িতেও যেতে হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে নন্দবাবুর বিরুদ্ধে তো কোন চার্জশীট্ ফ্রেম করা যাচ্ছে না।

দুটো ঘটনার মধ্যে নিশ্চয় একটা লিঙ্ক আছে। গোটা ব্যাপারটা খুব ভালভাবে খতিয়ে দেখতে হবে, অপরাধীকে খুঁজে বার করতে হবে, সময় লাগবে।

—তাহলে স্যার, এখন আমরা এখানে কী করব?

—হোপ্‌লেস! কিছু করার নেই। কোম্‌-অপারেশন তো চালানো হল, বরং দু'চারদিনের জন্য এখানে একটা পুলিশ-পোষ্ট বসিয়ে ফিরে যাই চলুন। দু'চার দিন কোন হাঙ্গামার রিপোর্ট না-পেলে এবং এই এলাকায় শান্তি বজায় থাকলে তখন পোষ্ট তুলে নেওয়া যাবে। আর শহরের চারপাশে নজর রাখতে হবে, সন্দেহজনক ব্যক্তিকে থানায় হাজির করতে হবে, জেরা করতে হবে।

এই সিদ্ধান্ত স্থির হল। দারোগাবাবু শ্মশান এলাকায় পুলিশ-পোষ্ট বসিয়ে বাদবাকি দলবল নিয়ে ফিরে গেলেন।

*   *   *

দুপুরের দিকে খবর পাওয়া গেল গোবিন্দর সোমত্ত মেয়েটাকে কাল রাত থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ কেউ সন্দেহ করছে সে সাধুবাবার সঙ্গে কাল রাতেই পালিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, বেশ কিছু গহনাগাটি নিয়েই সে উধাও হয়ে গেছে ইদানীং মেয়েটা প্রায়ই নন্দকিশোর সরকারের স্ত্রীর কাছে যাতায়াত করত। নন্দকিশোরের স্ত্রীর সমস্ত জড়োয়ার গহনা, হীরে ও সোনার যাবতীয় অলঙ্কার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মেয়েটা এসব জিনিসের খোঁজ খবর জানত। নন্দকিশোর সরকারের স্ত্রী নাকি মেয়েটার বিয়ের ব্যবস্থাও করতে চেয়েছিল এবং শোনা যাচ্ছে বিয়ের সময় কিছু কিঞ্চিৎ গহনা দেবার কথাও দিয়েছিল। কারণ নন্দবাবুর স্ত্রী বুঝেছিল সাধুবাবার সঙ্গে মেয়েটার যে গূঢ় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সেখান থেকে নজর ফেরাতে গেলে এছাড়া পথ ছিল না। এক লোভ থেকে নজরকে অন্য লোভের দিকে ফেরানো বোধ হয় তার উদ্দেশ্য ছিল। মনে হয় গোবিন্দ নন্দবাবুর মোকামের গরিব কর্মচারী এবং যেহেতু নন্দবাবুই এখানে সাধুবাবাকে এনেছিলেন, সেই সব কারণেই ভদ্রমহিলা এই

রকম ব্যবস্থা নেবার কথা ভেবেছিল। তার ভাবনা যে অমূলক ছিল তা বলা যায় না। তাতে গোবিন্দ রেহাই পেত, নন্দবাবুর মুখরক্ষা হত এবং মেয়েটাও বাঁচত। কিন্তু ভুল হয়েছিল ঐ গূঢ় সম্পর্কের ব্যাপারটা নন্দবাবুর স্ত্রী ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। মেয়েটা নন্দবাবুর স্ত্রীর সব কথাকে ধাপ্পা বলে মনে করতে পারে কিংবা আদত রহস্য গোপন রেখে যাতায়াত করে থাকতে পারে। যাই হোক নন্দবাবুর স্ত্রী মেয়েটাকে নাকি বাক্স খুলে সব গহনাগাটি দেখিয়ে বিয়ের জন্য দু'একটা পছন্দ করে রেখেছিল। আর সেই সব গহনা ধুয়েমুছে হাতিয়ে নিয়েই মেয়েটা সাধুবাবার সঙ্গে পালিয়েছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহরের পথেঘাটে জটলা জমে উঠল। শোনা গেল মেয়েটা ইতিপূর্বে দু'একবার পালাবার চেষ্টা করেছিল। পাড়ার দু'একটি ছেলেকে পাকড়াও করেও শেষ পর্যন্ত সে ধরে রাখতে পারেনি, ফসকে গেছে। ফলে মেয়েটির মনের মধ্যে নাকি কিছুদিন থেকেই ভৈরবী হবার বাসনা জেগেছিল। কেউ কেউ বলল, এর জন্য গোবিন্দ দায়ী। কেউ বলল, নন্দবাবু। প্রথম পক্ষের যুক্তি হল গোবিন্দ মেয়েটির বিয়ের চেষ্টা করেনি কেন? দ্বিতীয় পক্ষের যুক্তি হল নন্দবাবু সাধুকে এখানে আমদানি করে নিয়ে না-এলে এসব কোন ঘটনাই ঘটত না। তৃতীয় পক্ষের মন্তব্য হল ওসব ধর্ম-টর্মের টানে নয়, আসলে মেয়েটির মধ্যে কাম প্রবৃত্তির তাড়না অতি উগ্র ছিল, হিতাহিত জ্ঞান তার আদৌ ছিল না। শহরের দু'একজন উঁচুদরের শিক্ষিত লোক সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে খাটো গলায় নিস্পৃহ মন্তব্য করল: মনের সুপ্ত কামনা-বাসনা একটা অচেতন স্তরে থাকে। সেই গভীর হাইবার্নেশন্ থেকে তা জেগে ওঠার উদ্দীপনা পেলে এসব ঘটনা ঘটতে পারে। তখন ন্যায়-অন্যায় বোধ, হিতাহিত জ্ঞান ঠিক কতটুকু লোপ পায় তা হিসেব কষে বলা যায় না। মুনিদেরও মতিভ্রম ঘটে।

যাই হোক, মেয়েকে নিয়ে এতকাল গোবিন্দর সাংসারিক বিড়ম্বনার অন্ত ছিল না। যদিও ছোট খাটো ঘটনা এতদিন ঢাকা চাপা ছিল, যার ফলে নন্দবাবুর কিংবা অন্দরমহলে তাঁর স্ত্রীর কানেও মেয়েটির

সম্পর্কে বিশেষ কিছু পৌঁছয়নি। কিন্তু এখন এমন ভাবে সব কিছু উদাম হয়ে গেল যে লোকমুখে হাতচাপা দেওয়া দায়। কেউ কেউ এমন কথাও বলল যে সমস্ত ঘটনার পিছনে গোবিন্দর হাত আছে। গহনার অর্ধেক ভাগ বাপকে দিয়ে মেয়ে সাধুর সঙ্গে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়েছে। গোবিন্দকে একটু চাপ দিলেই সব বেরিয়ে যাবে।

খবরে আরও জানা গেল যে মেয়েটা রোজই ওর মায়ের সঙ্গে সাধু-বাবার কাছে জলপড়া আনতে যেত এবং শেষ দিন মায়ের অসুস্থতার জন্য সে বাচ্চা ভাইকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। সন্দেহ করা হচ্ছে সেদিন সমস্ত পরিকল্পনা খুব গোপনে হয়েছিল এবং সাধুবাবা মেয়েটার হাতে একটা সেঁকো বিষের পুরিয়া দিয়েছিলেন। নন্দকিশোব সরকারের স্ত্রী সাধুবাবার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে রিপোর্ট করার হুমকি দিয়েছিল। সাধুবাবা নন্দকিশোর সরকারের স্ত্রীর মুখ বন্ধ করার জন্যেই নিশ্চয় এই কাজ করেছেন।

গোবিন্দর সোমত্ত মেয়েটা একমাত্র নন্দকিশোর সরকারের স্ত্রীর কাছেই সাধুবাবার সঙ্গে রাত্রি যাপনের সমস্ত ঘটনা খুলে বলেছিল। মেয়েটা তার মায়ের কাছেও মুখ খুলে নাকি কিছুই বলেনি। মেয়েটা সেই রাত্রি যাপনের পর মুখ বন্ধ করে থেকেও শেষ পর্যন্ত নন্দ-কিশোরের স্ত্রীর চাপে পড়ে ঝোঁকের মাথায় সব কিছু খুলে বলে ফেলেছিল। হয়ত মেয়েটা পরে ভেবেছে যে নন্দকিশোর সরকারের স্ত্রী টাকা-পয়সা গহনাগাটি দিয়ে ওর বিয়ে দিলেও, কখনও কোন এক সময়ে এই ভদ্রমহিলার মুখ থেকেই ওর যাবতীয় কীর্তি-কেলেঙ্কারির কথা ফাঁস হয়ে যেতে পারে। সুতরাং সাধুবাবার মুখের দিকে তাকিয়েই শুধু নয়, ঝোঁকের মাথায় সব কিছু খুলে বলে ফেলে সে যে-ভুল করেছে তা সংশোধনের জন্যে এবং নিজের পথের কাঁটা সরানোর জন্যেই মেয়েটা এই কাজ করেছে। কিংবা মেয়েটা সাধুবাবার কাছে এমন কিছু একটা পেয়েছে যাতে সে মোহমুগ্ধা হয়েছে। এবং এসব ব্যাপার এত গোপনে ঘটেছে যে কাকপক্ষীতে টের পায়নি।

গোবিন্দ নন্দকিশোরের গরিব কর্মচারী। সাধুবাবার সঙ্গে রাত্রি-

যাপনের উড়ো খবর পেয়ে নন্দকিশোরের স্ত্রী গোপনে গোবিন্দকে তলব করে পরের দিনই মেয়েকে ডেকে পাঠিয়েছিল। তারপর থেকে প্রায় দিনই মেয়েটা নন্দকিশোর সরকারের স্ত্রীর কাছে গোপনে অন্দরমহলে যাতায়াত করত। এইভাবে ঘনঘন যাতায়াতের দরুন অন্দরমহলের অনুপুঙ্খ খোঁজখবর মেয়েটির হাতের মুঠোয় এসে যায়। শুধু তাই নয়, এর ফলে মেয়েটি ভদ্রমহিলার কিছুটা আস্থা অর্জনও করে ফেলে। কিন্তু মেয়েটা কোন দিন সাধুবাবার কাছে জলপড়া আনতে যাবার কথা নন্দবাবুর স্ত্রীকে বলেনি। অন্দরমহলে থেকে ভদ্রমহিলা এত খুঁটিনাটি খবর জোগাড় করতেও পারেনি। গোবিন্দর স্ত্রীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ থাকলে হয়ত ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিত। অথবা যা ঘটবার তা ঠিকই ঘটত। নন্দবাবুর স্ত্রী শেষ পর্যন্ত সব খবর পেয়েছিল। কিন্তু তখন আর কিছু করার ছিল না। দুর্ঘটনা যা ঘটার তা ইতিমধ্যে ঘটে গেছে। ব্যস্ত মানুষ নন্দকিশোর এতসব খুঁটিনাটি খবর আগে জানতে পারেননি, কিংবা জানলেও তিনি ব্যাপারটা এত গুরুত্ব দিয়ে ভাবেননি।

সন্দেহ করা হচ্ছে গোবিন্দর মেয়েটা আগের দিন সন্ধ্যায় সাধুবাবার কাছ থেকে সেঁকো বিষ এনে নন্দকিশোর সরকারের স্ত্রীর জর্দার কৌটায় পরের দিন বিকেলের দিকে গোপনে ঢেলে রেখেছিল। সেদিন সন্ধ্যা থেকে নন্দকিশোরের স্ত্রী পান-জর্দা হয়ত একটু বেশী পরিমানেই খেয়েছিল। তারপর থেকে সারা রাত তাকে নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড।

আজ বিকেলের দিকে খবর পাওয়া গেল পোষ্ট্‌মর্টেম্‌ রিপোর্টে এবং জর্দার কৌটায় সেঁকো বিষ পাওয়া গেছে।

যখন গতকাল রাতে শ্মশান অঞ্চলে দু'পক্ষের প্রচণ্ড বোমবাজি চলছে, তখন সারারাত ধরে নন্দকিশোর সরকার তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে তোলপাড় করছেন। ডাক্তার বদ্যিতে সারা বাড়ি ছেয়ে গেছে। সারারাত ধরে ভুগে আজ ভোরের দিকে নন্দকিশোর সরকারের স্ত্রী মারা গেছে।

নন্দকিশোর সরকার শিশুর মত তাঁর স্ত্রীর বুকের ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। তখন পূর্বদিকে সূর্য উঠছে।

*　　　　　*　　　　　*

রাত্রিবেলা। শ্মশানে দাহ করার জন্যে নন্দকিশোর সরকারের স্ত্রীকে বহন করে আনা হল। নির্জন শ্মশান। জনমনিষ্যির সাড়াশব্দ নাই। ঝোপেঝাড়ে জোনাকি জ্বলছে। রাতচরা পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। ঝিঁঝির একটানা শব্দ ভেসে আসছে।

শ্মশানে ডোম নাই। পদম ও শুখরামের খোঁজ করা হল। ওদের ঘরে তালা ঝুলছে। নন্দকিশোরের কাঠের মোকামেও কোন লোকজন নাই। সব গেল কোথায় ? সাত-আটজন লোক কে কোথায় উধাও হয়ে গেছে। শ্মশান মন্দিরে সাধুবাবাও নাই। দূরে বড় রাস্তার ওপরে পুলিশ-পোষ্ট বসেছে। নন্দকিশোর চারপাশে কেমন যেন উন্মাদের মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগলেন।

নির্জন ফাঁকা শ্মশান। এই দুর্দিনে নন্দকিশোর সরকারের পাশে কেউ নাই। এতকাল ধরে তিনি যাদের পুষে এলেন তারা সবাই সরে গেছে। নন্দকিশোর সরকার নিজের হাতে এই শ্মশান এতকাল গড়ে তুলেছেন। অর্থ, যশ ও সম্পদের প্রয়োজন এ-দুনিয়ায় কার না আছে ? কিন্তু তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মানুষের এই চরম দুর্দিনের সময় কাঠ যোগান দিয়ে যেমন সাহায্য করেছেন, তেমনি শোকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, অন্যের দুঃখ-বেদনায় কতদিন তিনি নিজেও অশ্রু বিসর্জন করেছেন। কতদিন গভীর রাত পর্যন্ত শ্মশান যাত্রীদের সঙ্গ দিয়েছেন। আর আজ এই চরম দুঃখ ও বিপদের দিনে তাঁর পাশে প্রকৃত বন্ধু কে আছে ? সাহায্য, সান্ত্বনা বা সহানুভূতি জানাবার মত প্রকৃত সমব্যথীজন কোথায় ? হায়রে কপাল ! বুক ফাটিয়ে সেই ভোর থেকেই তিনি কাঁদছেন। আর কাঁদবার মত ক্ষমতাও যেন তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। এখন শুধু স্ত্রীর মৃতদেহের পাশে বসে গালে হাত দিয়ে অপলক নেত্রে তাকিয়ে রয়েছেন। হায়রে কপাল !

কিন্তু, না ! আর তো এভাবে বসে থাকা চলেনা। যে চলে গেছে তাকে তো আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। চিতা সাজাতে হবে, মুখাগ্নি করতে হবে। ডোম নাই, যে চিতা সাজাবে। সন্তান নাই, যে

মুখাগ্নি করবে। বন্ধু নাই, যে পাশে দাঁড়াবে। চারপাশে ঘোর অন্ধকার। দুর্যোগময় রাত্রি।

নন্দকিশোর নিজেই উঠে পড়লেন। তাঁর পাশে দাঁড়াবার মত যদি কেউ না-থাকে তো দরকার নাই। স্ত্রী তো তাঁর সতীলক্ষ্মী ছিল। তিনি তার পাশে আছেন। তিনি একাই আছেন। ডোমেরা কেউ না থাক, তাঁর পোষা লোকজন সব দূরে সরে থাক, দরকার নাই। নন্দকিশোর নিজেই ডোম সাজলেন। তিনি একাই নিজের কাঠগোলা থেকে নিজের হাতে সমস্ত কাঠ উজাড় করে এনে চিতা সাজালেন, মুখাগ্নি করলেন। এ আগুন যেন আর না নেভে, এ যেন অনন্তকাল ধরে জ্বলে।

চিতা ধরল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। নন্দকিশোর পাগলের মত সারারাত ধরে একের পর এক কাঠ এনে নিজের হাতে চিতায় সাজিয়ে দিতে লাগলেন। দাউ দাউ করে কাঠ জ্বলতে লাগল। তিনি যেন ক্ষেপে গেছেন। গোটা বিশ্ব-সংসারকে তিনি যেন এই চিতার আগুনে জ্বালিয়ে দিতে চান এবং অবশেষে নিজেও জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে যেতে চান।

শ্মশান বন্ধু হিসেবে যারা এসেছিল তারা নন্দকিশোরকে আর ধরে রাখতে পারছে না। নন্দকিশোর প্রথম থেকেই কাউকে চিতার কাছে আসতে দেননি, এখনও কাউকে কাছে আসতে দিলেন না। ওঁর স্ত্রীকে শ্মশানে বহন করে এনে এবং চিতায় তুলে দিয়ে শ্মশান বন্ধুরা যতটুকু সাহায্য করেছে, এইটুকু যথেষ্ট। আর নয়। আর যেন তাঁর স্ত্রীকে কেউ না ছোঁয়। তিনি সবাইকে দূরে হটিয়ে দিয়ে পাগলের মত একের পর এক কাঠ এনে পুড়িয়ে ফেলতে লাগলেন। কারণ আরও আগুন চাই। দ্বিগুণ তেজে আগুন জ্বলে না-উঠলে চলবে কেন? নিজে ঝাঁপ দিবেন কী করে? সব কাঠ জ্বেলেই তো তাঁকে ঝাঁপ দিতে হবে। তিনি যখন পুড়বেন তখন আর কে কাঠ এনে দিবে? তিনি যে একা, তিনি যে বিশ্ব-সংসারে এখন থেকে বড় একা হয়ে গেলেন। হাউ হাউ করে কাঁদতে গিয়েও আর পারলেন না নন্দ-কিশোর। তাঁর গলা দিয়ে আর কোন শব্দ বেরোচ্ছে না।

ভোর হয়ে এল। ভোরের বাতাসে ঈষৎ স্নিগ্ধতা। ক্লান্ত নন্দকিশোর এবার ফের গালে হাত দিয়ে স্ত্রীর চিতার পাশেই বসে পড়লেন। তাঁর স্ত্রী আর নাই। শুধু ভস্ম পড়ে আছে। কিন্তু নন্দকিশোরের বুকের মধ্যে চিতার আগুন এখনও দাউ দাউ করে জ্বলছে।

দূরে বড় রাস্তা। এ পাশে ভাগীরথী নদী। নদীর স্রোত কুল-কুল ধ্বনিতে বহে চলেছে। মাঝখানে শ্মশানে স্ত্রীর চিতাভস্মের পাশে একা বসে আছেন নন্দকিশোর। আর কতক্ষণ থাকবেন কে জানে! শ্মশান বন্ধুরা চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেউ আর তাঁর কাছাকাছি আসতে সাহস করছে না।

দূরে বড় রাস্তা ধরে এক পথচারী ভিখারী বাউল গান গাইতে গাইতে চলে যাচ্ছে। সেই গানের সুর নদীর স্রোতে আর ভোরের বাতাসে মিশে যেন আবহমান কাল ধরে বহে চলেছে। পথিক বাউল গাইতে গাইতে চলেছে:

হায়রে মন, আর কেঁদোনা।
এ ভব-সংসারের লীলা
সাঙ্গ হলে, যাবে চলে
এ-জগতে কেউ রবে না।
